'দত্তা'-পরিচয়

শ্রীপ্রমথনাথ পাল, বি-এ

প্রাপ্তিস্থান :—

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড্ সন্স্
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

৪৯, বাহির শুঁড়া রোড,
বেলেঘাটা, কলিকাতা হইতে
গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

গ্রন্থকারের আর একখানি পুস্তক
'শরৎ-সাহিত্যে নারী'
শীঘ্রই বাহির হইবে।

মূল্য আট আনা

১।২ দুর্গা পিতুড়ী লেন,
মডার্ণ আর্ট প্রেস হইতে
শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

উৎসর্গ

মা ও বাবার

শ্রীচরণে

ভূমিকা
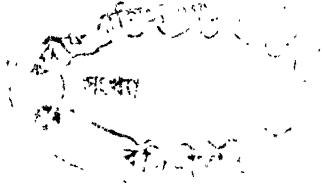
এ অভিযোগ মিথ্যা নয় যে, আধুনিক বঙ্গ-সাহিত্যে চিন্তাপ্রসূত জিনিসের অভাব ঘটিতেছে। একই মাসের কয়েকখানি মাসিক পত্রের পৃষ্ঠা খুলিলেই এ অভিযোগের সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ থাকিবে না। যে-সব নবীন লেখকের লেখা দেখিবার সুবিধা ঘটে তাহাতে বিশ্লেষণমূলক বা চিন্তাপূর্ণ আলোচনা অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল মাত্র, কবিতা আর গল্প সাহিত্যের পুষ্টি-সাধনে পর্য্যাপ্ত নহে। আলোচনা, সমালোচনা ও গবেষণা সাহিত্যকে সারবান্ করিয়া তুলে। যে তুইটি সাহিত্য আমাদের হাতের কাছে, সংস্কৃত এবং ইংরেজী, সেই তুইটিতে কি প্রচুর চিন্তাপূর্ণ জিনিস যে আছে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এক-একটা কাব্য বা এক-একটা তত্ত্ব সম্বন্ধে রাশি রাশি রচনা এই তুইটি সাহিত্যে বর্ত্তমান। ভাবুকের নিকট দেখিবার ও ভাবিবার বিষয় অনেক আছে। নিজে অনুসন্ধান করা এবং পরকে অনুসন্ধান করিতে প্রবৃত্ত করা রচনার একটা বিশেষ কাজ। এই বিশেষ কাজের বিশেষ প্রয়োজন আছে। মৌলিক রচনা এবং সমালোচনা-মূলক প্রবন্ধ আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে দিনের পর দিন বাড়িতে থাকুক, ইহাই কামনা।

আধুনিক বঙ্গসাহিত্যে যে তিনটি ব্যক্তি—মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথ—অদম্য প্রতিভাগুণে অকুতোভয়ে নব যুগের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন তাঁহাদের সৃষ্টির আলোচনার যেমন প্রয়োজন, তেম্নি এই ত্রয়ীর পরে যে চতুর্থ প্রতিভার জাগরণ বঙ্গসাহিত্যে আনন্দের কারণ, সেই শরৎচন্দ্রের সৃষ্টির বৈশিষ্ট্যগুলিও সাধারণের সমক্ষে তুলিয়া ধরার প্রয়োজন আছে। মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথকে পাওয়ার পরে অনেকে মনে করিয়াছিলেন যে, বঙ্গসাহিত্যের সৌভাগ্যের পূর্ণতা ঘটিয়াছে, কিন্তু তাহা ঠিক নহে। সাহিত্যে চিরদিনই নব নব পথিকের যাত্রাপথের অবকাশ থাকে।

শরৎচন্দ্র আসিলেন পল্লীর দুঃখ-দারিদ্র্য-কলহ-দুর্ব্বলতা ও ভাব-মহিমা সমন্বিত অনাড়ম্বর বাঙ্গালী জীবনের চিত্র লইয়া। ত্রয়ীর সৃষ্টিচাতুর্য্যের পরেও এই চিত্রের সৌন্দর্য্য আমাদিগকে মুগ্ধ করিল। আদর্শবাদের সীমার বাহিরে একেবারে ঘরোয়া বাস্তব খুটিনাটি ব্যাপারের নিখুঁত ছবিটি বাঙ্গালীর চিত্ত জয় করিল।

এই শরৎচন্দ্রের আবেগময় দরদের কথার আলোচনা করিলে তাহা মিষ্ট বই খারাপ লাগিবে না। তাঁহার শক্তির কৌশল কি কি এবং কোথায় তাহা কেহ দেখাইলে আমরা আনন্দই লাভ করিব।

স্নেহভাজন শ্রীমান্ প্রমথনাথ পাল আমার ছাত্র। বহু ছাত্রই রচনার খাতা লইয়া আসা-যাওয়া করেন। কিন্তু অধিকাংশ রচনাতেই যত্ন, চিন্তা ও মনোযোগের অভাব দেখিতে পাই। গোড়ায় গোড়ায় প্রমথনাথের প্রবন্ধও কাঁচা ছিল,—কিন্তু তাহাতে একটি আশার রশ্মি এই ছিল যে, লেখকের ভাবিবার ইচ্ছা প্রবল। এই ইচ্ছার বশেই তিনি পরে পরে অনেকগুলি রচনা আমাকে দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার যে রচনাটিতে তাঁহার চিন্তা ও বিশ্লেষণের শক্তি রসবেত্তার নিকট আদৃত হইতে পারিবে বলিয়া আমার মনে হইয়াছে তাহা এই "দত্তা-পরিচয়," অর্থাৎ শরৎচন্দ্রের 'দত্তা' উপন্যাসের আলোচনা বা রস-গ্রহণ। এই আলোচনা লেখকের যে বয়সে রচিত হইয়াছে তাহা বলিবার মত বয়স নয়, অর্থাৎ লেখক সবেমাত্র কলেজ হইতে বাহির হইয়াছেন। তথাপি, আমার আশা—এই রচনায় আমি যেমন আনন্দ লাভ করিয়াছি, সাধারণ পাঠকও সেইরূপ আনন্দ পাইবেন। ছাত্র পুত্রের তুল্য, সেখানে অধিক প্রশংসার অবকাশ নাই। আর, এই "দত্তা-পরিচয়"এ লেখকের যে বিশ্লেষণ-শক্তি দেখিতে পাওয়া গেল, তাহা ক্রমেই বর্দ্ধিত হউক্, ইহাই আমার কামনা।

বঙ্গবাসী কলেজ, কলিকাতা
মাঘ, ১৩৪২

শ্রীপ্যারীমোহন সেনগুপ্ত

নিবেদন

শরৎচন্দ্রের অধুনা-প্রকাশিত গ্রন্থগুলি ব্যতীত অন্যান্য গ্রন্থগুলির মধ্যে 'দত্তা' আমার অধিক ভাল লাগে। এই ভাল-লাগাটাই আমার বর্ত্তমান পুস্তক রচনার প্রেরণা। এই ভাল-লাগার বশেই আখ্যায়িকাখানি সম্বন্ধে আমার যে ধারণা জন্মিয়াছে তাহাই এই পুস্তকে, শরৎচন্দ্র বা তাঁহার সৃষ্ট চরিত্রগুলির উপর কোন-প্রকার সজ্ঞান পক্ষপাতিত্ব না করিয়া, সরলভাবে সন্নিবিষ্ট করিতে চেষ্টা করিয়াছি মাত্র। ইহার মধ্যে আমার সমালোচনা-ক্ষমতা জাহির করিবার প্রয়াস, বা শরৎ-সাহিত্য সম্যক্ উপলব্ধি করার গর্ব্ব, অথবা কোন-প্রকার মত বা নীতি প্রতিষ্ঠিত করিবার ইচ্ছা নাই।

'দত্তা'-আখ্যায়িকার মধ্যে পরিচ্ছেদগুলি যে ভাবে সাজান রহিয়াছে এই পুস্তকে চরিত্র-বিশ্লেষণ করিতে গিয়া আমি সেই পদ্ধতি অনুসরণ করি নাই। প্রথমে অবশ্য সেই পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া পুস্তক-রচনা শেষ করিয়াছিলাম। কিন্তু চরিত্রের সমস্ত অংশ এক স্থানে গ্রথিত হইলে যোগসূত্র বিচ্ছিন্ন না হইয়া চরিত্রটিকে সমগ্রভাবে বুঝিয়া লইবার সুবিধা হইতে পারে—এই প্রস্তাব পরে আমার পরম-শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়ের নিকট হইতে পাই। তদনুযায়ী পুনরায় প্রত্যেকটি চরিত্রের পৃথক্‌ভাবে পূর্ণ বিশ্লেষণ করিয়াছি। আবশ্যক বোধ হওয়ায় পুস্তকখানির মধ্যে 'দত্তা'-আখ্যায়িকার বহু অংশ উদ্ধৃত করিতে হইয়াছে। তাহাতে চল্‌তি কথার, বিশেষভাবে ক্রিয়াপদের, বানান বিষয়ে শরৎচন্দ্রের অনুসৃত বানানের সহিত নানা কারণে নানা স্থানে অনিচ্ছাকৃত অসঙ্গতি দৃষ্ট হইতে পারে। সেইজন্য এখানে শরৎচন্দ্রের নিকট ত্রুটি স্বীকার করিতেছি।

এই পুস্তকের রচনার প্রথম হইতে মুদ্রণের শেষ পর্য্যন্ত যিনি অতিশয় স্নেহ-সহকারে নানাভাবে উপদেশ দিয়া ও সাহায্য করিয়া আসিয়াছেন তিনি আমার সাহিত্য-সেবায় একমাত্র সহায় ও উৎসাহদাতা পরম শ্রদ্ধাস্পদ অধ্যাপক শ্রীযুক্ত প্যারীমোহন সেনগুপ্ত মহাশয়। তিনি পাণ্ডুলিপিখানি আগাগোড়া পড়িয়া দেখিয়া দিয়াছেন, মুদ্রণ-সময়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া প্রুফ্ কপি সংশোধন করিয়া দিয়াছেন এবং ভূমিকাও লিখিয়া দিয়াছেন। তাঁহার নিকটে ত নানা দিক্ দিয়া বিশেষ ঋণী হইয়াই আছি। এখন যে আরও ঋণী হইলাম তাহাও এখানে জানাইতেছি। পুস্তকখানি শীঘ্র প্রকাশিত হইবার বিষয়ে মডার্ণ আর্ট প্রেসের শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় যে সৌজন্য ও তৎপরতা দেখাইয়াছেন, সেজন্য আমি তাঁহার নিকট আন্তরিক কৃতজ্ঞ। আমার অক্ষমতা-প্রযুক্ত পুস্তকে যে-সমস্ত ভ্রম-প্রমাদ দৃষ্ট হইবে তাহা পাঠকগণ মার্জ্জনা করিবেন। ইতি—

শ্রীপ্রমথনাথ পাল

কলিকাতা,
মাঘ, ১৩৪২
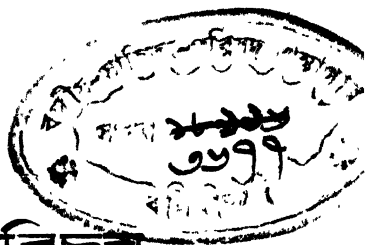
'দত্তা'-পরিচয়

——:০:——

আখ্যায়িকার 'দত্তা' নামের সার্থকতা

'দত্তা' কথার অর্থ দান করা হইয়াছে এমন স্ত্রীলোক। কিন্তু এখানে 'দত্তা' কথাটি 'বাগ্দত্তা' কথারই সংক্ষেপরূপে ব্যবহার করা হইয়াছে। 'বাগ্দত্তা' কথার অর্থ বিধি-অনুযায়ী বাক্য দ্বারা দত্তা কন্যা অর্থাৎ যে কন্যার বিবাহ সম্বন্ধ বিধি-অনুযায়ী স্থির হইয়া গিয়াছে, কিন্তু আচারাদি পালন সহ বিবাহ-কার্য্য শেষ হয় নাই। যে বিজয়াকে কেন্দ্র করিয়া আখ্যায়িকার সৃষ্টি, সেই বিজয়ার জন্মের পূর্ব্ব হইতেই তাহাকে অপরের হাতে সঁপিয়া দেওয়ার কথা স্থির হইয়া গিয়াছে। "জগদীশের ছেলে হইলে সে বনমালীকে সুসংবাদ দিয়া এলাহাবাদ হইতে লিখিল, 'তোমার মেয়ে হইলে, তাহাকে পুত্রবধূ করিয়া, ছেলেবেলায় যে পাপ করিয়াছি, তাহার কতক প্রায়শ্চিত্ত করিব'। বনমালী তাহার উত্তরে লিখিলেন, 'বেশ! তোমার ছেলের দীর্ঘ-জীবন কামনা করি। কিন্তু আমার মেয়ে হওয়ার কোন আশাই নাই, তবে যদি কোন দিন মঙ্গলময়ের আশীর্ব্বাদে সন্তান হয়, তোমাকে দিব।'—প্রথম পরিচ্ছেদ। বলা বাহুল্য, এখানে সন্তান অর্থে কন্যা। এইভাবে জন্মের পূর্ব্বেই বিজয়ার বাগ্দান ব্যাপার শেষ হইয়া গেল। ইহা বেশ ঘোরাল রকমের না হইলেও একটু নূতন ধরণের ব্যাপার বটে! পল্লীগ্রামের দিকে অধিকাংশ স্থলে নিছক কৌতুকের বশে দুই বন্ধুর একজনের ছেলে ও অপরের মেয়ের ভবিষ্যৎ

বিবাহের কথা উল্লেখ করিয়া বৈবাহিক (চল্‌তি কথায় বেয়াই, বেহায়া নয়) সম্বন্ধ স্থাপনের মধ্যেও এই প্রকার বাগ্দানের অসম্পূর্ণ ও অসংস্কৃত পরিণতি দেখা যায়। কোন কোন স্থলে যে বিবাহ না ঘটে এমন নহে। আখ্যায়িকার একেবারে শেষ সীমায় দেখা যায়, বিজয়া জন্মের পূর্ব্বেই যাহার হস্তে অর্পিত হইবে বলিয়া কথা ছিল তাহারই হস্তে অর্পিত হইল। তারপর আখ্যায়িকা আর অগ্রসর হয় নাই। কাজেই আখ্যায়িকার 'দত্তা' নাম সার্থক হইয়াছে বলিতে হইবে।

বাগ্দানের সময় কয়েকটা আচারও পালন করিবার ব্যবস্থা শাস্ত্রে দেখা যায়। কিন্তু বিজয়ার ক্ষেত্রে তার কিছুই হয় নাই, এবং হওয়াও কোন দিক্ দিয়াই সম্ভব ছিল না। প্রথম ও প্রধান কথা, বাগ্দানের সময় বিজয়ার জন্মই হয় নাই, আর বিজয়ার জন্ম হইলেও যেখানে ধর্ম্ম-মতের পার্থক্য থাকায় উভয় পক্ষের মধ্যে বিবাহের প্রথাই নাই সেখানে বাগ্দান আর তার আচার পালনের কথা আসিতেই পারে না। কাজেই বাগ্দানের কাজটা এভাবে শেষ করিয়া আখ্যায়িকাকার এক দিক এড়াইয়া নিপুণতার পরিচয় দিলেন। এই প্রকার বাগ্দানের উপর নরেন্দ্র ও বিজয়ার মিলন সম্পূর্ণ নির্ভর করে না, ইহাকে দুই অন্তরঙ্গ বন্ধু বনমালী ও জগদীশের যৌবনোচিত একটা আনন্দোচ্ছ্বাসের বহির্বিকাশ বলিয়া উড়াইয়া দিতে পারা যায়। তা' ছাড়া ধর্ম্মমতের পার্থক্যের প্রাচীর উভয়কে বাধাদানের প্রতীকরূপে অবস্থিত। তর্কের এই প্রকার যুক্তি খণ্ডন করিতে পারা যায়। বনমালী 'চিরদিনই ভগবৎপরায়ণ এবং ধর্ম্মভীরু,' তিনি বাঁচিয়া থাকিলে ধর্ম্মমতের পার্থক্য মানিয়া চলিতেন না, তিনি একবার যে বিষয়ে কথা দিয়াছেন তাহা পালন করিতে নিশ্চিতই সঙ্কোচবোধ করিতেন না ; এই বাগ্দান ব্যাপারটা বনমালীর পক্ষে নিছক আনন্দোচ্ছ্বাস নয় ; যৌবনের এই কথা তিনি দীর্ঘ পঁচিশ বৎসরেও ভুলিতে পারেন নাই, তাই, মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি বলিয়াছিলেন, 'জানিস্ মা বিজয়া, এই

জগদীশ যখন একটা মানুষের মত মানুষ ছিল, তখন তুই না জন্মাতেই তোকে তার এই ছেলেটির নাম কোরেই চেয়ে নিয়েছিল, আমিও মা কথা দিয়েছিলাম।'—২য় পরিচ্ছেদ। ধর্ম্মের পার্থক্য থাকিলেও বনমালী অন্তরের সহিত কথা দিয়াছিলেন। 'তবু, তোকে সত্যি বল্‌ছি বিজয়া, সে সময়ে জগদীশকে তোর সম্বন্ধে আমার মনের কথাই দিয়েছিলাম।'—২য় পরিচ্ছেদ। এই মনের দেওয়াই সব-চেয়ে বড় দেওয়া। ইহার নিকট বিধি-ব্যবহারের কথা তুচ্ছ ব্যাপার। আর জগদীশ এখন আর গ্রামের অধিবাসী নহে, এক মস্ত সহরের বাসিন্দা। সে উচ্চশিক্ষিত, তারও ওকালতি ব্যবসায়ে দু'পয়সা রোজগার হয়। 'তোমার দয়াতেই উকীল হইয়া সুখে আছি।'—প্রথম পরিচ্ছেদ। কাজেই জগদীশের দিক হইতেও তাহার পুত্র নরেন্দ্রের এ প্রকার বিবাহ সম্বন্ধ স্থির করিবার ইচ্ছা এমন কিছু অস্বাভাবিক নয়। ইহাও লক্ষ্যের বিষয়। 'বছর দুই পূর্ব্বে তাহার (বনমালীর) অপর বন্ধু রাসবিহারীর যখন ছেলে হয়, সেও ঠিক এই প্রার্থনাই করিয়াছিল।'—প্রথম পরিচ্ছেদ। ইহার উত্তরে বনমালীর সম্মতির কোন উল্লেখ নাই, ইহাও লক্ষণীয়। যাহাই হউক, নিপুণ শিল্পী তাঁহার উদ্দেশ্য—'মনের মিলনই সত্যিকার বিবাহ' (শেষ পরিচ্ছেদ)—সম্পূরণের পোষকতা করিবার অভিপ্রায়ে প্রথম পরিচ্ছেদেই এক শ্রেণীর পাঠকের জন্য বাগ্‌দান প্রসঙ্গে একটা কৈফিয়ৎ টানিয়া দিয়া গেলেন।
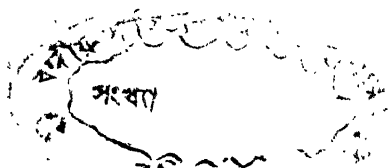
বিজয়া

বিজয়া-চরিত্রের প্রথম পরিচয়

প্রথমেই বিজয়ার প্রকৃতিতে একটা দৃঢ়তা লক্ষিত হয় যাহা আধুনিক-শিক্ষিতা, আলোকপ্রাপ্তা মেয়ের চরিত্রে সম্ভব। 'কিন্তু তাঁর অবর্ত্তমানে সমস্ত বিষয় মিছামিছি তাঁর ছেলেকে কেন ছেড়ে দেব? তাঁকে তুমিও কখনও দেখনি, আমিও দেখিনি। আর যদি সত্যই তিনি লেখাপড়া শিখে থাকেন, অনায়াসেই ত পিতৃঋণ শোধ করতে পারবেন। যে না পারে, সে কু-সন্তান, বাবা, তাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।'—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। এই প্রকার উক্তি 'সুশিক্ষিতা', 'তেজস্বিনী,' ধনী ব্রাহ্মকন্যার পক্ষে সঙ্গত ও শোভনীয়। বনমালী যখন বিজয়াকে নরেন্দ্রের হাতে দানের কথা তুলিলেন তখন বিজয়া নারীসুলভ লজ্জা-সঙ্কোচ বোধ করে নাই। 'বাবা, তুমি তাঁকে শুধু মুখের কথাই দিয়েছিলে, তোমার মনের কথা দাওনি, তা দিলে কি একবার তাঁকে চোখের দেখা দেখ্‌তেও চাইতে না?'—২য় পরিচ্ছেদ। ইহাতে বিজয়ার আব্দার অপেক্ষা অনুযোগের সুরই ধ্বনিত হইয়াছে। তারপর বনমালী নরেন্দ্রনাথের স্বাস্থ্য ও জীবন সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, তাহাতে বিজয়ার শ্রবণাৎ পূর্ব্বরাগ হওয়া ত দূরের কথা, তাহার পক্ষে এ বিষয়ে আর কোন প্রশ্ন না করাটাই যেন স্বাভাবিক। বিজয়া প্রশ্ন করিয়াছিল, 'এইটাই কি সংসারে সব-চেয়ে বড় পারা, বাবা'?—দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ। ইহার মধ্যে বিজয়ার ভগবানের সম্বন্ধে সংশয়াকুল চিত্তের পরিচয় পাওয়া যায়। তবে সে স্বর্গগতা মাতার কথার উল্লেখে অভিভূত হইয়া এই উক্তি করিয়া থাকিলেও থাকিতে পারে। বিজয়া-চরিত্রে যে দৃঢ়তা ছিল তাহার ভিত্তি তত শক্ত ছিল না। ইহা পরে একে একে আলোচনা করা যাইতেছে।

বিলাসের প্রতি বিজয়ার আসক্তি

বিলাসের প্রতি বিজয়ার একটা টান আছে। উভয়েই ব্রাহ্মসমাজের, সহরে থাকিয়া মানুষ হইয়াছে, ইংরেজী ধরণে উচ্চশিক্ষা পাইয়াছে। বিলাস বিজয়ার বাটীতে 'আসা-যাওয়া' করে। এই 'আসা-যাওয়া' লইয়া বিলাসের সহিত বিজয়ার ভাব হয়। বনমালী জগদীশের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলে বিজয়া বলিয়াছিল, "তাঁর অবর্ত্তমানে সমস্ত বিষয় মিছামিছি তাঁর ছেলেকে কেন ছেড়ে দেব? যে (পিতৃঋণ শোধ করতে) না পারে, সে কু-সন্তান। তাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।" এই কথাগুলি তাহার শুধু উচ্চশিক্ষা লাভের দৃঢ়তা-প্রসূত নয়। বিলাসবিহারীর প্রতি তাহার একটা আকর্ষণও এই দৃঢ়তা অবলম্বনে তাহার শক্তি বাড়াইয়া দিয়াছিল। "এক সময়ে সে যে বিলাসকে পছন্দ করিয়াছিল এবং তাহারই সহিত একযোগে পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নরেন্দ্রের সর্ব্বনাশ কামনা করিয়াছিল সেই কামনাই আজ তাহার সমস্ত শুভ-ইচ্ছাকে পরাভূত করিয়া জয়লাভ করিতেছে, মনে করিয়া তাহার বুক ফাটিতে লাগিল।"—১৪শ পরিচ্ছেদ। বিলাস সুদর্শন। 'সে বেঁটে, মোটা এবং ভারী যোয়ান। তাহার বুকের পাঁজর বোমা মারিয়া নির্দ্দেশ করা যাইত না।'—৩য় পরিচ্ছেদ। বিজয়া এ হেন যুবক বিলাসের সান্নিধ্য লাভের জন্য উৎসুক। 'সে-দিন বিলাসের আগমন-সংবাদে কন্যার মুখের উপরে যে আরক্ত আভাটুকু দেখা দিয়াছিল, বৃদ্ধকে (বনমালীকে) তাহা ব্যথাই দিয়াছিল।'—২য় পরিচ্ছেদ। 'জমিদার কন্যার বয়স অল্প, মাথা গরম, রাসবিহারীর পুত্রের সঙ্গে বিবাহের জনশ্রুতিও গ্রামে অপ্রচারিত ছিল না।'—চতুর্থ পরিচ্ছেদ। যা' রটে তার কিছু বটে।

বনমালী ও জগদীশের মৃত্যুর পর বিলাস জগদীশের ঘর-বাড়ী দেনার দায়ে দখল করিয়া ব্রাহ্মমন্দির প্রতিষ্ঠার কথা উত্থাপন করিল। বিজয়া মৃত পিতার শেষ কথাগুলি স্মরণ করিয়া সঙ্কুচিত হইল। কিন্তু বিলাসের

লম্বা বক্তৃতার একটা 'ময়্যাল এফেক্‌ট্' হইল। বিজয়ার নাম-যশের আকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠিল। কিন্তু এক্ষেত্রে বিলাস না হইয়া আর কেহ বক্তৃতা করিলে 'ময়্যাল এফেক্‌ট্' কতখানি হইত বলা যায় না। নরেন্দ্রের প্রসঙ্গ এবং 'জগদীশ-বাবুর বাড়ীটা যদি আমরা সত্যই দখল ক'রে নিই, গ্রামের মধ্যে কি একটা বিশ্রী গোলমাল উঠ্‌বে না? আমরা কখনই ত সেখানে যাইনে, আমার দেশের বাড়ী ত বাস করার উপযুক্ত নয়'—এই সব কথার উত্থাপন করিয়া আখ্যায়িকাকার বিজয়াকে বাঁচাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। তোষামোদ করিলে দেবতারও মতি-পরিবর্ত্তন হয়, বিজয়ার ত দূরের কথা। বিলাস বলিল,—'আমি মনে করেছি, তার (নরেন্দ্রের) বাড়ীটায় আপনার নাম ক'রে যা কোথাও নেই, কোথাও হয় নি—আমি তাই কোর্‌ব। যাকে (বনমালীকে) তারা নির্য্যাতন ক'রে দেশ থেকে বিদায় ক'রে দিয়েছিল, সেই মহাত্মারই মহীয়সী কন্যা তাদেরই মঙ্গলের জন্য এই বিপুল স্বার্থত্যাগ করেছেন, প্রজাদের একবার তাদের মহারাণীকে দেখ্‌তে দিন,—আমার ত নিশ্চয়ই মনে হয়, এ সৌভাগ্য থেকে তাদের বঞ্চিত করা মহাপাপ'—৩য় পরিচ্ছেদ।—এই প্রকার আত্ম-প্রশংসায় বিজয়া অভিভূত হইয়া পড়িল। তাই তাহার 'সাত-পুরুষের বাস্তু-ভিটা' অথচ 'যে ভিটার সহিত তাহার জন্মাবধি পরিচয় নাই, তাহাই আজ তাহাকে দুর্নিবার শক্তিতে টানিতে লাগিল।'—৩য় পরিচ্ছেদ। এই টানিবার সময় তাহার বাস্তুভিটার সহিত মৃত পিতার আদেশ রক্ষা করিবার অছিলায় নরেন্দ্রকে একবার দেখিবার ক্ষীণ ইচ্ছাটুকু তাহার অন্তরের কোণে উঁকি মারিল কি না কে জানে।

বিজয়া ও বিলাসের মধ্যে মনোমালিন্যের সূত্রপাত

বিলাসেরই আগ্রহে আগ্রহান্বিত হইয়া বিজয়া সহর হইতে গ্রামে আসিয়াছিল। বিলাসেরই প্রশংসা-বাক্যে মুগ্ধ হইয়া সে গ্রামে ব্রাহ্ম-

মন্দির স্থাপনার প্রস্তাবে উৎসাহিত হইয়াছিল। কিন্তু গ্রামে আসিয়া বিলাসের উৎকট ধর্ম্মভাব ও সেই অজুহাতে বিজয়ার সুখ ও তৃপ্তি সাধনের জন্য তাহার চেষ্টাই উভয়ের মনোমালিন্যের আপাতঃ মূলীভূত কারণ হইয়া দাঁড়াইল। বিলাস নরেন্দ্রের দুর্গাপূজার অনুমতির প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিল, অথচ সে এ বিষয়ে কোন প্রকার উচ্চ-বাচ্য করিবার অধিকারী নয়। আর বিজয়া তাহার আপন অধিকার লইয়াই স্বীয় ধর্ম্মভাব, শিক্ষা ও অবস্থার সদৃশ উদারতার সহিত নরেন্দ্রনাথের প্রার্থনা মঞ্জুর করিল। ইহাতে অজ্ঞাতসারে অচেনা নরেন্দ্রনাথের উপর বিজয়ার সহানুভূতি গিয়া পড়িল। কিন্তু বিলাস তাহা সহ্য করিবে কেন? কারণ, প্রথমতঃ, বিজয়াকে সুখী করিবার উল্লাসময় কল্পনা ও ভ্রান্ত চেষ্টার ব্যর্থতা; দ্বিতীয়তঃ, বিজয়া কোন প্রকারে তাহার সামান্যমাত্রও অবাধ্য হইয়া চলে ইহা তাহার পক্ষে সহনাতীত ব্যাপার; তৃতীয়তঃ, বিলাসের ধর্ম্মভাব গভীর না হইলেও উৎকট।

বিজয়ার হৃদয়ে উদ্বেগ ও নরেন্দ্রনাথের খবর জানিবার জন্য ঔৎসুক্য

নরেন্দ্রনাথ প্রথম তাহার মামার হইয়া দুর্গাপূজার হুকুম লইবার জন্য বিজয়ার নিকট আসিয়াছিল। তখন কেহ কাহারও নিকটে পরিচিত ছিল না। তা' ছাড়া নরেন্দ্রনাথ এমন অবস্থায় ও এমন ভাবে আসিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল যে, তখন তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিবার খেয়াল বিলাস বা বিজয়া কাহারও হয় নাই।

গ্রামে আসিবার পর হইতে মুমূর্ষু পিতার আদেশটাই বিজয়ার বেশী করিয়া মনে পড়িতেছিল। যদিও বিজয়া পিতার আদেশ অগ্রাহ্য করিবার জন্য বিলাসের প্ররোচনায় নাম-যশের আকাঙ্ক্ষায় নরেন্দ্রকে গৃহহীন করিবার বাহ্য উদ্দেশ্যে গ্রামে আসিয়াছিল, তাহা হইলেও কোন কাজ করিতে সায় দেওয়া, আর সেই কাজ নিজের চোখে হইতে দেখা—ইহার

মধ্যে প্রভেদ অনেক। এখন নরেন্দ্রকে সত্যই গৃহহীন হইতে দেখিয়া বিজয়ার নারী-হৃদয় চঞ্চল হইয়া উঠিল। বিজয়া (রাসবিহারীকে) কহিল, 'বাবা মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে আদেশ ক'রে গিয়েছিলেন, ঋণের দায়ে তাঁর বাল্যবন্ধুর বাড়ীঘর যেন বিক্রী ক'রে না নিই,' 'জগদীশ-বাবুর পুত্রকে ডাকিয়ে পাঠিয়ে সমস্ত কথা জানান হয়, এই আমার ইচ্ছে,' 'আপনি একবার তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে এ বিষয়ে তাঁর কি ইচ্ছা জান্‌তে পার্‌বেন না কি?' —৫ম পরিচ্ছেদ। নোটিশ দিবার পরেও বিজয়া নরেন্দ্রনাথের বাড়ী ছাড়িয়া দেওয়ার বিষয়ে রাসবিহারীকে আপত্তি জানাইয়াছিল। রাসবিহারীর কথার উত্তরে বিজয়া বলিয়াছিল, 'এটা (অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথের বাড়ী বিক্রয় করিয়া না লওয়া) বাবার শেষ অনুরোধ। তা' ছাড়া আমি শুনেচি তিনি (নরেন্দ্রনাথ) একঘরে, গৃহহীন কর্‌লে আত্মীয়-কুটুম্ব কারও বাড়ীতেই তাঁর আশ্রয় পাবার পথ নেই। তা' ছাড়া গৃহহীন কথাটা মনে কর্‌লেই আমার ভারী কষ্ট হয়, কাকাবাবু।'—৭ম পরিচ্ছেদ। বিজয়া-চরিত্রে দৃঢ়তা ছিল, কিন্তু সেই দৃঢ়তাকে রক্ষা করিবার মত সাহসের অভাবও ছিল। সেই জন্য সে রাসবিহারীর প্রস্তাবে সোজাসুজি 'না' বলিতে পারে নাই।

বিলাসের উপর বিজয়ার আর পূর্ব্বের মত টান ছিল না, বিলাস তাহাকে রূঢ় কথা শুনাইয়াছে, তাহার অপমান করিয়াছে। সে (বিলাস) নিজের স্বভাবটাকে একেবারে অনাবৃত উলঙ্গ করিয়া দিয়া নিরতিশয় কটুকণ্ঠে বলিয়া ফেলিল, 'মেয়ে মানুষ জাতটাই এমনি নেমকহারাম।' —৫ম পরিচ্ছেদ।

তারপর নদীর ধারে ছিপে মাছ ধরিবার সময়ে নরেন্দ্রনাথের সহিত বিজয়ার দেখা। কাহারও সহিত আলাপ করিতে গেলে প্রথমে তাহার বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসা করিতে হয়, তারপর নাম। বাড়ীর কথা জিজ্ঞাসার উত্তরে নরেন্দ্রনাথের গ্রাম দিঘড়ার নাম শুনিয়া সেই যে বিজয়ার চিত্ত

নরেন্দ্রনাথের বিষয় জানিবার জন্য কুতূহল হইয়া উঠিল এবং কথার স্রোত নরেন্দ্রনাথের বিষয় লইয়া সীমাবদ্ধ হইয়া রহিয়া গেল, তার মধ্যে অপরিচিত নরেন্দ্রনাথকে তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিবার আর অবসর আসিল না। এই সময় হইতে নরেন্দ্রনাথের সম্বন্ধে আরও কিছু জানিবার জন্য বিজয়ার চিত্ত উন্মুখ হইয়া রহিল।

সুতরাং পরদিন নির্দ্দিষ্ট সময়ে বিজয়া গোপন আশা লইয়া বেড়াইবার ছলে নদীর ধারে সেই স্থানটিতে গিয়া উপস্থিত হইল। নরেন্দ্র নির্দ্দিষ্ট স্থানটিতে বসিয়া মাছ ধরিতেছিল। বিজয়া স্ত্রীলোক, কথা বলিতে গেলে স্ত্রীলোকের পক্ষ হইতে প্রথমে সঙ্কোচ আসে। তাই কি ছলে সে সেখানে দাঁড়াইয়া নরেনের সহিত আলাপ করিবে এবং অপরিচিত নরেন্দ্রনাথের বিষয়ে আরও কিছু জিজ্ঞাসা করিবে সে-দিক দিয়া সে সঙ্কোচ ও সরম বোধ করিতেছিল। কুশলী আখ্যায়িকাকার কৌশলে বিজয়াকে দাঁড় করাইলেন এবং সেই অপরিচিত মুখ দিয়াই নরেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেন। আজও এই অপরিচিত লোকটির সহিত বিজয়ার যে কথোপ-কথন হইল তাহা কেবল নরেন্দ্রনাথের বিষয় লইয়াই শেষ হইয়া গেল। অপরিচিত লোকটির নামটা জিজ্ঞাসা করিবার কথা বিজয়া একেবারে ভুলিয়া গেল। নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিজয়ার উত্তরোত্তর আগ্রহবৃদ্ধি এই বিস্মৃতির কারণ বলা যাইতে পারে।

এখানে পাঠকের চিত্ত স্বতঃই বলিয়া উঠে, দুই দুইবার দেখা হইল, অথচ বিজয়া একবারও নামটা জিজ্ঞাসা করিল না। বিজয়া শিক্ষিতা যুবতী মহিলা, যাকে বলে forward, নামটা ত জিজ্ঞাসা করিলেই পারিত। বিজয়ার চিত্তেও যে একথা না জাগিয়াছে এমন নয়। কিন্তু শরৎচন্দ্র, বিজয়া ও সেই সঙ্গে পাঠককে বেশীক্ষণ এই অবস্থায় না রাখিয়া ঘটনাস্রোত অন্যদিকে ফিরাইলেন। তারপর যখন নরেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ উঠিবে, তখন বিজয়া এই লোকটির যে কেবল নাম জানিবে তাহা নহে, এই লোকটিই যে তাহার

অভীপ্সিত নরেন্দ্রনাথ তাহাও তাহার জানিতে বাকী থাকিবে না। বিজয়া ও পাঠক যে বেদনা ভোগ করিতেছেন, এইবার তাহার দ্বিগুণ আনন্দ লাভ করিবেন।

বিজয়ার জয় না পরাজয়?

বিলাস কলিকাতা হইতে সব ঠিকঠাক করিয়া, এমন কি, ব্রাহ্মনেতা-দিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিবার পরও বিজয়া গ্রামে জগদীশের বাড়ীতে ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা বিষয়ে আপনার দৃঢ় অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছে। বিজয়া বলিয়াছিল, 'আমি ভেবে দেখ্‌লুম, এখানে এই নিয়ে সমারোহ কর্‌বার দরকার নেই। এখানে ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা করার কোন সার্থকতা নেই, সে হবে না।'—অষ্টম পরিচ্ছেদ। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিজয়ার প্রকৃতিতে দৃঢ়তা ছিল, দৃঢ়তা রক্ষা করিবার মত উপযুক্ত সাহস ছিল না, দৃঢ়তা রক্ষা করিয়া চলিবার মত তাহার কোন বাস্তব অবলম্বন বা আশ্রয় ছিল না। এ-দিক দিয়া সে ছিল অসহায়া। সে নারী, বিরাট বিষয়ের মালিক, রক্ষণা-বেক্ষণের ভার ছিল ধূর্ত্ত রাসবিহারী ও তস্য পুত্র বিলাসবিহারীর কর্ত্তৃত্বের উপর, নাম না করাই ভাল। অবশেষে পিতাপুত্রের সম্মুখে বিজয়াকে বলিতে হইল, 'তিনি (নরেন্দ্র) ইচ্ছে ক'রে চ'লে না গেলে ত কিছুই হ'তে পারে না।'—নবম পরিচ্ছেদ। ইহা অসহায়ের শেষ উক্তি। নরেন্দ্রবাবু যদি ইচ্ছা করিয়া চলিয়া যান, তবে না হয় শেষ পর্য্যন্ত তাঁর বাড়ীটাতে সমাজ প্রতিষ্ঠা হউক—এই রকম ভাব। কিন্তু রাসবিহারী যে পূর্ব্বাহ্ণেই নরেন্দ্রকে বাড়ী ছাড়াইবার জন্য ব্যবস্থা করিয়াছেন, তাহা বলাই বাহুল্য। তা'ছাড়া নরেন্দ্রনাথ শিক্ষিত, সরলপ্রাণ ও নিরহঙ্কার যুবক, তাঁর একটা ভদ্রতাজ্ঞান আছে। যে বাড়ী দেনার দায়ে মহাজনের হাতে পড়িয়াছে, সেই বাড়ী ছাড়িয়া যাইবার জন্য নোটিশ পাইবার পরও তিনি আর সে বাড়ীতে থাকিতে যাইবেন কেন?

বিজয়ার দৃঢ়তা এইখানে হার মানিল। নরেন্দ্র প্রকৃতই গৃহশূন্য হইল। কিন্তু এইবার ঘটনাস্রোত যেদিকে প্রবাহিত হইল, তাহাতে বিজয়া জয়ের পথে চলিল। নরেন্দ্রনাথ যে তাহার সম্পত্তি এবং সেই সঙ্গে বিজয়ার বিষয়ের মালিক হইবে, তাহার পথও খোলসা হইতে চলিল। কারণ, এই সময় হইতে বিজয়ার হৃদয়-সিংহাসনে নরেন্দ্রনাথের জন্য আসন পাতা হইতে লাগিল। নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিজয়ার টান বাড়িল। এইখানে আখ্যায়িকা বিভক্ত হইয়াছে বলা যায়।

নরেন্দ্রনাথের সহিত বিজয়ার পরিচয়

নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিজয়ার আগ্রহ জন্মিয়াছিল, কিন্তু এ আগ্রহ প্রকাশ পায় নাই, জানাজানি হয় নাই, অপর কাহারও নিকটে নরেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিতে বিজয়ার সঙ্কোচ বোধ হয়। বিজয়াই যখন সে অঞ্চলের জমিদার তখন সে ইচ্ছা করিলেই লোক পাঠাইয়া নরেন্দ্রকে অনায়াসে আপনার বাড়ীতে ডাকাইতে পারিত অথবা একটা খোঁজ লইতে পারিত। কিন্তু সে-দিক দিয়া সে সঙ্কোচ বোধ করে। তাই আজ পরেশকে দিয়া সে নরেন্দ্রের খোঁজ লইতে উদ্যোগী হইয়াছে। কিন্তু যখন পরেশ নরেন্দ্র-বাবুর সন্তোষজনক কোন খবর আনিতে পারিল না, অধিকন্তু বলিল—কোথায় চ'লে গেছে—তখন বিজয়ার সমস্ত অন্তঃকরণ নৈরাশ্য ও বিরক্তিতে ভরিয়া গেল। এই অশান্তি তাহাকে বেশী ক্ষণ ভুগিতে হইল না।

নরেন্দ্রনাথের সহিত বিজয়ার আলাপ হইল। আলাপের ধরণটাও যেন পাঠকের উপভোগ্য। নরেন্দ্রনাথের সহিত বিজয়ার আলাপ হওয়ার সময়ে পাঠকের মন স্বতঃই উল্লসিত হয় এবং তাহার হাসি পায়। তারপর আলাপটা বেশ ভালভাবেই জমিয়া গেল। এতক্ষণ বিজয়া ও সেই সঙ্গে পাঠক যে অস্বস্তি ভোগ করিতেছিলেন এইবার আখ্যায়িকাকার তাহার দ্বিগুণ আনন্দ দিলেন।

নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিজয়ার আগ্রহবৃদ্ধি

নরেন্দ্রনাথের সহিত কথা বলিতে বলিতে তাহার সারল্য ও আত্ম-ভোলাভাবে বিজয়া মুগ্ধ হইয়া গেল, আর এই সঙ্গে নরেন্দ্র যখন আপনার দরিদ্র অবস্থার কথাটা একটু উল্লেখ করিয়া ফেলিল, তখন বিজয়ার চোখে জল আসিল। দুঃখের কথায় নারী-হৃদয় বিচলিত হওয়া আশ্চর্য্যের নহে। কিন্তু এই নরেন্দ্রকে গৃহশূন্য করিবার জন্যই (?) বিজয়া সহর হইতে গ্রামে আসিয়াছিল, কিন্তু আজ তাহার দুঃখের কথায় বিজয়ার চোখে জল আসে কেন? উত্তরে না হয় বলা যায়, তখন দুঃখের প্রকৃত ছবিটা চোখে পড়ে নাই, আজ চোখের সাম্‌নে দুঃখের দাহ দ্বিগুণভাবে দীপ্তি দিয়াছে। খাওয়ার কথা বলিতে গিয়া বিজয়া নরেন্দ্রকে অনুরোধ করিলেই ত পারিত, নরেন্দ্রের যাইবার পথ আগলাইবার জন্য তাহার বেগে কবাটের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইবার প্রয়োজন ছিল না। ইহাতে আর যাহাই প্রকাশ হউক না কেন, একজন অপর ব্যক্তিকে নারীর পক্ষ হইতে একান্ত আপনার জন ভাবিবার মধুর ইচ্ছাটাই প্রকাশ পায়। খাইতে বসিয়া নরেন্দ্র সব দুধটুকু খায় নাই। তাহাতে বিজয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছে, ইহাও লক্ষণীয়। নরেন্দ্রবাবুর বর্ম্মায় যাওয়া হউক, বা, না হউক, তাহাতে বিজয়ার কিছু আসে যায় না। কিন্তু তবু আজ সে কিসের প্রেরণায়, কিসের উত্তেজনায় কিছুমাত্র দরকার না থাকিলেও নরেন্দ্রনাথের নিকট হইতে মাইক্রস্কোপটা কিনিয়া লইতে প্রস্তুত হইয়াছে এবং নরেন্দ্রনাথ চিরদিনের জন্য এদেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবার পূর্ব্বে তাহার সহিত আর একবার দেখা করিবার সুযোগ গ্রহণ করিতেছে। 'সে (নরেন্দ্রনাথ) চলিয়া গেলে যতক্ষণ দেখা গেল, বিজয়া অপলক চক্ষে চাহিয়া রহিল, তারপরে ফিরিয়া আসিয়া সুমুখের চৌকিটার উপরে বসিল। কখনো বা তাহার মনে হইতে লাগিল, যতদূর দৃষ্টি যায় সব যেন খালি হইয়া গেছে—কিছুতেই যেন কোন দিন তাহার প্রয়োজন

ছিল না, কিছুই যেন তাহার মরণকাল পর্য্যন্ত কোন কাজে লাগিবে না'। —১১শ পরিচ্ছেদ। এ প্রকার মনোভাব কেবলমাত্র বিরহী বা বিরহিণীর পক্ষেই সম্ভব। কিন্তু যখনই সে তাহার এই মনোভাবের কথা টের পায়, তখনই তাহার স্বাভাবিক লজ্জা আসিয়া তাহাকে চাপিয়া ধরে। সে আপনাকে প্রকাশ হওয়ার হাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য ছদ্ম-গাম্ভীর্য্য ধারণ করে। মাইক্রস্কোপ দেখিবার সময় সে নরেন্দ্রকে বিরক্ত করিয়া আবার আমোদ অনুভব করিতেছে। উভয় পক্ষ হইতে না হইলেও অন্ততঃ এক পক্ষ হইতে প্রণয়-সঞ্চার না হইলে এ রকম ব্যবহার সম্ভব হয় না। একজনকে ঠকাইবার জন্য চেষ্টা করিলে এই রকম আমোদ অনুভব করা সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু যদি বিজয়া নরেন্দ্রকে ঠকাইবার মতলব করিত, মাইক্রস্কোপটা হাতে রাখিবার চেষ্টা করিত, তবে সে তাহার জন্য গোপনে অশ্রুমোচন করিত না। বিজয়া 'অবিচলিত কণ্ঠে বলিল, তার মুখ দেখেই আমার যেন রোজ ঘুম ভাঙ্গে।'—১২শ পরিচ্ছেদ। নরেন্দ্র আর দেখা করিতে পারিবে না বলায় বিজয়ার দুই চক্ষু জলে ভরিয়া গেল। এ সব কিসের চিহ্ন—আন্তরিক টান নয় কি? নরেন্দ্র মাইক্র-স্কোপ লইয়া বিজয়ার সহিত দেখা করিতে আসিলে বিজয়া যখন নরেন্দ্রনাথের সম্মুখে উপস্থিত হইল তখন 'তাহার পরণের কাপড়ে, মাথার ঈষৎ রুক্ষ এলোচুলে এমন একটা বিশেষত্ব ও পারিপাট্য ছিল, যাহা কাহারও দৃষ্টি এড়াইবার কথা নহে।'—১১শ পরিচ্ছেদ।

নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিজয়ার আগ্রহ বা প্রণয়-সঞ্চার কোন প্রকারে জানাজানি হইয়া পড়ে বা কোন পক্ষ হইতে বাক্যে বা ব্যবহারে কিছুমাত্র বাড়াবাড়ি ঘটে সে বিষয়ে সে সতর্ক ছিল। নরেন্দ্র যখন বলিল "আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, যে ছবি আঁক্‌তে জানে, তারই আপনাকে (বিজয়াকে) দেখে আজ লোভ হবে! বাঃ, কি সুন্দর!" তখন "বিজয়া মনে মনে বুঝিল, ইহা সৌন্দর্য্যের পদমূলে অকপট ভক্তের স্বার্থ-

গন্ধহীন নিষ্কলুষ স্তোত্র অজ্ঞাতসারে উচ্ছ্বসিত হইয়াছে এবং একথা একমাত্র ইহার (নরেন্দ্রনাথের) মুখ দিয়াই বাহির হইতে পারে। কিন্তু তথাপি সে গম্ভীরভাবে কহিল, "আমাকে এ রকম অপ্রতিভ করা কি আপনার উচিত? তা' একটা জিনিষ কিন্‌ব ব'লেই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, ছবি আঁক্‌বার জন্যে ত ডাকিনি।"—১১শ পরিচ্ছেদ। ইহাতে নরেন্দ্রনাথের হঠাৎ বাড়াবাড়িতে বিজয়ার পক্ষ হইতে আপনাকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে শীলতা-মিশ্রিত মৃদু তিরস্কার ও সাবধান-বাণীর সুর ধ্বনিত হয়।

পরে নরেন্দ্রনাথ যখন 'অকস্মাৎ হাত বাড়াইয়া বিজয়ার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—একি, আপনি কাঁদ্‌ছেন?' তখন বিজয়া বিদ্যুদ্বেগে দুই পা পিছাইয়া গিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল, পরে সে 'কান্না আর চাপিতে না পারিয়া দ্রুতপদে ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।'—দ্বাদশ পরিচ্ছেদ। তখন বিজয়ার নিজেকে সামলাইয়া লইবার ইহা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না। কারণ ইহারই পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে সে বিভোর হইয়া নরেন্দ্রনাথের কথা ভাবিতেছিল। শুধু তাহাই নহে, রাসবিহারী ও বিলাসবিহারী তাহারই অতিথি নরেন্দ্রনাথের প্রতি যে অসম্মানসূচক বাক্য নরেন্দ্রনাথকে শুনাইয়া শুনাইয়া প্রয়োগ করিয়াছিলেন তাহাতে তাহার মন ব্যথায় ও হৃদয় সহানুভূতিতে ভরিয়া গিয়াছিল।

নরেন্দ্র মাইক্রস্কোপ না লইয়া চলিয়া গেল।

বিজয়ার হৃদয়ে দ্বন্দ্ব

পুত্র বিলাসবিহারী ও পিতা রাসবিহারী যে-ভাবে বিজয়াকে চালিত করিয়া লইয়া যাইতেছেন, তাহাতে বিলাসের সহিত বিজয়ার বিবাহ হইয়া যাইবার কথা। এই প্রকার বিবাহের পক্ষে অবস্থা ও ঘটনা অনুকূলই বটে। তবে মাঝখানে এখন নরেন্দ্র আসিয়া দেখা দিয়াছে। ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে সমাগত ভদ্রলোকদিগের সম্মুখে রাসবিহারী

বেশ কৌশলে বিজয়ার বিবাহের কথা পাড়িয়া বিজয়ার মৌন সম্মতি পাইয়াছেন। বিজয়া এ সমস্তই ভালভাবেই বুঝিয়াছে। কিন্তু সে যে নরেন্দ্রকে ভুলিতে পারিতেছে না। অথচ "এক সময়ে সে যে নিজেই বিলাসকে পছন্দ করিয়াছিল এবং তাহারই সহিত একযোগে পিতার ইচ্ছার বিরুদ্ধেও নরেন্দ্রের সর্ব্বনাশ কামনা করিয়াছিল, সেই কামনাই আজ তাহার সমস্ত শুভ-ইচ্ছাকে পরাভূত করিয়া জয়লাভ করিতেছে, মনে করিয়া তাহার বুক ফাটিতে লাগিল।"—১৪শ পরিচ্ছেদ। এ-দিকে সে রাসবিহারী ও বিলাসবিহারীর বেড়াজালে পড়িয়াছে। এখন সে অসহায়া, উপায়হীনা, তাই এখন তাহার একমাত্র ক্রন্দন ছাড়া অন্য উপায় ছিল না, এমনি অবস্থায় পরদিন সে ভদ্রলোকদিগের সম্মুখে উপস্থিত হইতেই বিলাসবিহারী তাহার প্রতি রূঢ় অভদ্রতা প্রকাশ করিল, সে (বিলাসবিহারী) বলিয়া উঠিল, 'ঘুমটা এ বেলায় না ভাঙ্গ্‌লেই ত চল্‌ত। তোমার ব্যবহারে আমি ক্রমশঃ ডিস্‌গাস্‌টেড্‌ হ'য়ে উঠ্‌ছি। এ কথা না জানিয়ে আর আমি পার্‌লাম না।'—১৪শ পরিচ্ছেদ। ইহাতে বিজয়ার অন্তরে যে কতখানি আঘাত লাগিয়াছে তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না। কিন্তু পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বিজয়া এখন অসহায়া, উপায়হীনা, তাই এখন সে অন্তরে জ্বলিয়া যাইতে লাগিল, বাহিরে কিছু প্রকাশ করিতে পারিল না।

বিজয়া চিরদিনই ধর্ম্মভাবাপন্ন, তাই বৃদ্ধ দয়াল যখন ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠার গুণ-কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন, এবং বিজয়া যখন বুঝিল এই ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠায় বিলাসই কর্ত্তা, তখন বিজয়ার মন হইতে বিলাসের প্রতি বিদ্বেষ ভাবটা ক্রমশঃ ধীরে ধীরে সরিয়া যাইতে লাগিল। তাই সে বিলাসকে মনে মনে ক্ষমা করিল, এখন বিজয়ার মনে কোন গ্লানি নাই, "কিছুকাল অবধি একটা অব্যক্ত পীড়া কাঁটার মত তাহার মনের মধ্যে খচ্‌ খচ্‌ করিয়া অহরহ বিঁধিতেছিল আজ তাহার অকস্মাৎ বোধ হইল,

সেটার যেন খোঁজ পাওয়া যাইতেছে না।"—১৪শ পরিচ্ছেদ। যে বিলাসের উপস্থিতি বিজয়ার পক্ষে একটা অস্বস্তিকর ব্যাপার ছিল, যে বিলাসের সহিত কথা বলিতে হইলে সে কুণ্ঠাবোধ করিত, আজ সেই বিলাস আসিয়া যখন (তাহার পাশে) তাহার নির্দ্দিষ্ট আসন অধিকার করিয়া বসিল তখন সে জ্বালা নিবিতেও তাহার বেশী সময় লাগিল না।

নরেন্দ্রনাথের প্রতি যে বিজয়ার এক সময় অনুরাগ জন্মিয়াছিল বা সে নরেন্দ্রনাথকে খাতির করিত এবং সেজন্য সে রাসবিহারী বা বিলাসকেও পর্য্যন্ত দূরে রাখিয়া চলিত, আজ বিজয়ার মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিলে তাহা মনে পড়ে না। নরেন্দ্রনাথ অর্থহীন বলিয়া এখন তাহার প্রতি বিজয়ার করুণার ভাব আসিয়াছে। "আর কিছু নয়— শুধু যদি তাহার সেই একান্ত দুঃসময়ে কিছু বেশী করিয়াও জিনিষটার দাম দেওয়া হইত।" "আর একটা কথা স্মরণ হইলে সে যেমন আশ্চর্য্য হইত, তেমনি কুণ্ঠিত হইয়া পড়িত। দু'দিনের পরিচয়ে কেমন করিয়াই না জানি, এই লোকটার প্রতি এত স্নেহ জন্মিয়াছিল, ভাগ্যে তাহা প্রকাশ পায় নাই! না হইলে, মিথ্যা মোহ একদিন মিথ্যায় মিলাইয়া যাইতই, কিন্তু সারা জীবন লজ্জা রাখিবার আর ঠাঁই থাকিত না। তাই সেই দু'দিনের স্নেহ-মমতার পাত্রটিকে যখনই মনে পড়িত তখনই প্রাণপণ বলে মন হইতে তাহাকে সে দূরে ঠেলিয়া দিত।"—১৪শ পরিচ্ছেদ। যে বিজয়া একদিন নরেন্দ্রের সহিত দেখা করিবার জন্য ব্যগ্র হইয়া থাকিত, লোক পাঠাইয়া খোঁজ লইত, আজ সেই বিজয়া নরেন্দ্রকে ভুলিতে চেষ্টা করিল। মানুষ চায় তাহার মানসিক তৃপ্তি, ইহাও একটা স্বার্থ, যেখানে সে তাহার মানসিক তৃপ্তিলাভের কিছুমাত্র সন্ধান পাইবে সে সেইদিকে ধাবিত হইবে। ইহাতে আশ্চর্য্যের কিছুই নাই। বিজয়া কোমল-স্বভাবা; বিলাস রূঢ়প্রকৃতির, তাহার মধ্যে যেন কোমলতার অত্যন্ত অভাব। অবস্থার অনুপাতে বিজয়ার প্রতি ব্যবহারে বিলাসের

অভদ্রতাই প্রকাশ পাইয়াছে। কাজেই তখন বিজয়ার নরেন্দ্রের প্রতি টান হওয়া কিছুই অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু একটা জিনিষ বিলাস ও বিজয়ার মধ্যে সাধারণভাবে বর্ত্তমান—তাহা ধর্ম্মভাব। বিলাসের ধর্ম্মভাব উৎকট, বিজয়ার ধর্ম্মভাব গভীর ও শান্ত। যাহাই হউক, ধর্ম্মভাবের সূত্র লইয়া বিজয়া বিলাসকে ক্ষমা করিল, বিজয়া মানসিক তৃপ্তি লাভের আর একটা আশ্রয় বা পাত্র খুঁজিয়া পাইল। কাজেই এই অবস্থায় নরেন্দ্র-নাথের প্রতি তাহার আসক্তি স্বভাবতঃই শিথিল হইয়া আসিল।

নরেন্দ্রের প্রতি বিজয়ার আসক্তি

বিজয়া নরেন্দ্রকে ভুলিবার চেষ্টা করিয়াছে। সে আপনাকে স্থির ও নিশ্চিন্ত রাখিবার জন্য মনে মনে একটা শান্তির জাল বুনিয়া লইয়াছে। এইবার তাহার জীবন পরম শান্তির মধ্যে কাটিবে—এই ভাবিয়া সে একটা তৃপ্তি অনুভব করিতেছে। এমনি সময়ে নরেন্দ্র উল্কার মত আবির্ভূত হইয়া তাহার সমস্ত চিন্তা ও শান্তির জাল ছিঁড়িয়া টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া দিল। সে ছিন্ন জালে জোড়া লাগাইবার সামর্থ্য বিজয়ার নাই। তাই সে একবার চমকাইয়া অভিভূত হইয়া রহিল। নরেন্দ্র বিজয়াকে যতখানি বুঝিয়াছিল, বিজয়া নরেন্দ্রকে তাহা অপেক্ষা অধিক চিনিয়াছিল। তাই সে আজ নরেন্দ্রকে সম্মুখে উপস্থিত দেখিয়া খানিকটা অনাবিল রসিকতা করিবার লোভ সম্বরণ করিতে পারিল না। "আপনার মাথাটা তার চেয়েও শক্ত, ঢুঁ মারলে"—"আচ্ছা, আপনি ত ডাক্তার,—আপনি হাত দেখ্‌তে জানেন?" "নইলে আপনার গায়ে জোর আছে এবং হাতে লাঠি আছে" ইত্যাদি (১৫শ পরিচ্ছেদ) রসিকতার মধ্যে নরেন্দ্র উপহাসের গন্ধ পাইয়া রাগিয়া উঠিলেও বিজয়া তাহার স্বাভাবিক শান্ত ভাব হারায় নাই। বিজয়া নরেন্দ্রকে হীনভাবে উপহাস করিবার উদ্দেশ্যে

কোন কথা বলে নাই। কেবল তাহার দু' একটা কথা উপহাসের মত শুনাইতেছিল।

বিজয়া নরেন্দ্রকে অনেকটা চিনিতে পারিয়াছিল বলিয়াই সে প্রথম হইতেই নরেন্দ্রের সহিত নির্ম্মল রসিকতা করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল। কিন্তু নরেন্দ্রকে দেখিয়াই যেন বিজয়া নরেন্দ্রনাথের অজ্ঞাত শক্তির বলে অভিভূত হইয়াছিল। বসন্ত রোগের কথা উঠিতেই সে বলিল—'হ'লেই বা আমাকে দেখ্‌বে কে ? আমার কে আছে ?' নরেন্দ্র আবার আসিবে বলায় সে বলিল—'আপনার দয়া,' ইহাতে নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিজয়ার প্রকাশ্য প্রণয় সূচিত না হইলেও নরেন্দ্রকে তাহার আপনার জন বলিয়া ভাবিবার গোপন ইচ্ছাটা প্রকাশ পায়। আর সেই সঙ্গে প্রকাশ পায়, তাহার দাসদাসী, টাকাকড়ি থাকিলেও সে অসহায়। যে রাসবিহারী ও বিলাস তাহার প্রতি অসুবিধাটি দূর করিবার জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত এবং যে রাসবিহারী ও বিলাস তাহার বিশাল সম্পত্তিটাকে এক প্রকার অক্ষয় করিয়া রাখিয়াছে তাহাদেরও কাছে ত সে কখনও এমন করিয়া আপনার সহায়হীনতা বিষয়ে আক্ষেপ করে নাই। একদিন পরে নরেন্দ্র আসিতেই বিজয়া তাহাকে যে অন্তরের কথাগুলি বলিয়াছে তাহা নরেন্দ্র বা আমরা জ্বরের ঝোঁকের প্রলাপ বলিয়া মানিয়া লইলেও একটা কথা লক্ষ্য না করিয়া পারি না—বিজয়া বলিল, "আমি ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত তুমি কোথাও যাবে না বল—তুমি চ'লে গেলে হয়ত আমি বাঁচ্‌ব না,"—১৫শ পরিচ্ছেদ। এখানে নরেন্দ্রকে বিজয়ার 'তুমি' সম্বোধন করাটাও বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিজয়ার একটা টান ছিল, সে নরেন্দ্রনাথকে মনে মনে শ্রদ্ধা করিত। নরেন্দ্র বিলাত-ফেরৎ বড় ডাক্তার, তাহার ফিও বেশী, নামও যথেষ্ট, সে পণ্ডিত লোক, পরেশের ও নিজের অসুখের ব্যাপারে বিজয়া তাহার চিকিৎসার পরিচয় পাইয়াছে, তা' ছাড়া নরেন্দ্র

নিরহঙ্কার। সে তাহারই জন্য একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া, হয়ত বা তাহার কত কাজের ক্ষতি করিয়া অসুখের সময় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। এই সব ব্যাপারে নরেন্দ্রনাথের উপর শুধু বিজয়ার কেন, সকলেরই শ্রদ্ধা না আসিয়া পারে না; অবশ্য, রাসবিহারী ও বিলাসবিহারীর মত লোকের কথা স্বতন্ত্র। বিজয়া যে নরেন্দ্রকে আপনার লোক বলিয়া অন্তরে বিশ্বাস করিত তাহা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বিলাস কর্ত্তৃক নরেন্দ্রনাথকে বৃথা অপমানিত হইতে দেখিয়া সে একেবারে মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া যাইতে-ছিল। কিন্তু তখন সে রোগ-শয্যায় শায়িত, প্রবল জ্বরে ছট্‌ফট্ করিতেছে। সেইজন্য সে-যাত্রায় বিলাস কোন প্রকারে রক্ষা পাইয়া গিয়াছিল। বিজয়া যখন বুঝিল, নরেন্দ্র তাহারই জন্য দারুণ অপমানটা নীরবে সহ্য করিয়া যাইতেছে, তখন সে নরেন্দ্রকে আপনার কাছে আর ধরিয়া রাখিবার ইচ্ছা করিল না। সে বলিল, "আমি যতদিন বাঁচ্‌ব আপনার কাছে কৃতজ্ঞ হ'য়ে থাক্‌ব। কিন্তু এঁরা যখন অন্য ডাক্তার দিয়ে আমার চিকিৎসা করা স্থির ক'রেছেন তখন আর আপনি নিরর্থক অপমান সইবেন না।" —১৬শ পরিচ্ছেদ। বিজয়া নরেন্দ্রকে আপনার জন বলিয়া মনে করিত বলিয়া সে নরেন্দ্রকে এত অপমানিত হইতে দেখিয়াও বলিল, "কিন্তু ফিরে যাবার পথে দয়াল-বাবুকে একবার দেখে যাবেন, শুধু এই মিনতিটি রাখ্‌বেন।" —১৬শ পরিচ্ছেদ।

বিজয়া ও বিলাসের মধ্যে দ্বন্দ্ব

বিলাস কর্ত্তৃক নরেন্দ্রকে অপমানিত হইতে দেখিয়া বিজয়া একেবারে মর্ম্মে মর্ম্মে মরিয়া যাইতেছিল। কিন্তু তখন সে রোগ-শয্যায় শায়িত, প্রবল জ্বরে ছট্‌ফট্ করিতেছে। সেইজন্য সে-যাত্রায় বিলাস কোন প্রকারে রক্ষা পাইয়া গিয়াছিল। এ-দিকে রোগটা যেমন কিছু পরিমাণে সারিয়া গেল বিজয়ার রাগটাও তেমনি হ্রাসপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু ব্যাপারটার গুরুত্ব বিজয়া

ভুলিতে পারিল না। এ-দিকে হিংসুক বিলাসও নরেন্দ্রনাথের সূত্র ধরিয়া বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল। আর একদিন বিজয়ার সাম্‌নেই 'ডাক্তার ত নরেন ডাক্তার,' 'কলির ধন্বন্তরি,' 'কোথায় পেলেন সেটাকে' ইত্যাদি মন্তব্য করিয়া সে পুনরায় নরেন্দ্রের প্রতি বিদ্রূপ ও ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া লইল। ইহারই পূর্ব্ব মুহূর্ত্তে বিজয়া দয়ালের নিকট হইতে নরেন্দ্রনাথের চিকিৎসা-নৈপুণ্যের আর একবার পরিচয় পাইয়াছিল এবং নরেন্দ্রনাথ তাহাকে পুনরায় দেখিয়া গিয়াছেন অথচ সে তাহাকে চিনিতে পারে নাই, ইহাতে সে মনের মধ্যে যুগপৎ উল্লাস, লজ্জা ও ব্যথা অনুভব করিতেছিল। বিলাস ত আপনার সুযোগ-সুবিধামতই যখন পারিতেছিল এক একবার বিজয়ার শ্রদ্ধার পাত্র নরেন্দ্রনাথকে বিদ্রূপ, ঘৃণা ও অপমান করিয়া আসিতেছিল। তার উপর আবার বিজয়ার আর এক শ্রদ্ধার পাত্র দয়ালের উপর তাহার অযথা অন্যায় চোট পড়িল। বিজয়া আজ আর রোগ-শয্যায় শায়িতা নয়, সে খানিকটা বল পাইয়াছে, তাই সে আর বিলাসকে ছাড়িয়া কথা কহিল না, সে বিলাসের কাজ না করার দরুণ, বিনা কারণে কামাই করার দরুণ মনিবের ন্যায় কৈফিয়ৎ চাহিয়া বসিল। কথায় কথায় তাহার রাগ বাড়িয়া যাইতেই সে বলিয়া উঠিল, "কাজ কর্‌বার জন্য যাকে মাইনে দিতে হয় তাকে ও-ছাড়া (অর্থাৎ চাকর ছাড়া) আর কি বলে? আপনার অসংখ্য উৎপাত আমি নিঃশব্দে স'য়ে এসেছি, কিন্তু যত সহ্য ক'রেছি, অন্যায় উপদ্রব ততই বেড়ে গেছে, যান, নীচে যান (বিলাসের যেন আর উপরে আসিবারও অধিকার নাই), প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ ছাড়া আজ থেকে আপনার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ থাকবে না। যে নিয়মে আমার অপর কর্ম্মচারীরা কাজ করে, ঠিক সেই নিয়মে কাজ ক'র্‌তে পারেন ক'র্‌বেন, নইলে আপনাকে আমি জবাব দিলুম। আমার কাছারীতে আর ঢোক্‌বার চেষ্টা ক'র্‌বেন না।" "আমার ষ্টেটেই চাকরী ক'র্‌বেন, আর আমারই উপর অত্যাচার ক'র্‌বেন। আমাকে 'তুমি' বল্‌বার অধিকার কে

আপনাকে দিয়েছে? আমার চাকরকে আমার বাড়ীতে জবাব দেবার, আমার অতিথিকে আমার চোখের সাম্‌নে অপমান কর্‌বার এ সকল স্পর্দ্ধা আপনার কোথা থেকে জন্মাল?"— ১৮শ পরিচ্ছেদ।

বিজয়ার নিরুদ্বেগ

সে-দিন বিজয়ার নিকটে বিলাস যে ভাবে তিরস্কৃত ও অপমানিত হইয়াছে, তাহাতে বিলাস ও বিজয়ার মধ্যে যে মিলনের কথা আর আসিতেই পারে না—ইহা সকলেরই ধারণা। মানুষের রাগ কখনও খুব দীর্ঘ কাল থাকে না, বিজয়ারও তাহাই হইল। সুচতুর রাসবিহারী আসিয়া বিজয়ার সে-দিনের ব্যবহার সমর্থন করিলেন এবং তাহাকে খানিকটা বাড়াইয়া দিলেন, সেই সঙ্গে তিনি বিলাসকে দোষান্বিত করিয়া তাহাকে আরও খানিকটা শাস্তিভোগ করিতে দিবার জন্য বার বার অনুরোধ করিয়া গেলেন। রাসবিহারীর বক্তৃতার ফল ফলিল। রাসবিহারী তথা বিলাসের প্রতি বিজয়ার অন্তরের মধ্যে যে অশ্রদ্ধা জন্মিয়াছিল তাহা অনেকটা সরিয়া গেল। বিলাসের উপর তাহার রাগ পড়িয়া আসিল এবং সে বিলাসকে মনে মনে ক্ষমা করিয়া লইল। বিলাসও বিজয়ার নিকট আসিয়া অত্যন্ত নম্রভাবে পুনরায় আলাপ করিয়া গিয়াছে, কিন্তু বলা বাহুল্য, বিলাসের প্রতি বিজয়ার আসক্তি জন্মে নাই।

নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিজয়ার আসক্তি-বৃদ্ধি

ইতোমধ্যে বৈশাখের প্রথম দিনে নরেনও আসিয়া আর একবার দর্শন দিল। রাসবিহারী নরেনকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন—কেবলমাত্র ভদ্রতার খাতিরে নয়, স্নেহের বশে নয়, উপাসনা-আসরে বিলাসের সহিত বিজয়ার আসন্ন বিবাহের কথাটা সকলকে শুনাইবার সঙ্গে সঙ্গে নরেনের কর্ণমূলে আর একবার ভাল করিয়া শুনাইবার জন্যই রাসবিহারী নরেনকে ডাকিয়াছিলেন। বিজয়ার প্রতি নরেনেরও একটা আকর্ষণ ছিল। সেও এ

সুযোগ অজ্ঞাতসারে ছাড়িল না। সে উপাসনা-আসরে আসিয়া উল্কার মত দর্শন দিল।

নরেন্দ্র ও নলিনী বিজয়ার নিকট হইতে বিদায় লইয়া চলিয়া যাইবার পর বিজয়া ছাদের উপর উঠিয়া তাহাদের বিশেষভাবে নরেনের গতি লক্ষ্য করিয়াছিল। তারপর সে নরেনকে দয়ালের বাড়ীতে না যাইতে দেখিয়া তাহাকে ডাকিয়া আনিবার জন্য পরেশকে পাঠাইয়া দিল। নরেনের প্রতি যদি বিজয়ার টান না থাকিত, তবে তাহার এত সব করিবার কি দরকার ছিল? বিজয়া নরেনকে অন্তরে একেবারে আপনার লোক বলিয়া মনে করিত। আপনারই লোকের উপর মানুষের অভিমান করা সাজে। নরেন পরেশের সঙ্গে ফিরিয়া আসিতে বিজয়া তাহাকে যে কথাগুলি বলিল তাহাতে কেবল তাহার অন্তরের চোখাচোখা অভিমানের সুর ও অনুযোগের বেদনা প্রকাশ পাইল। "না খেয়ে এত বেলায় চ'লে যাচ্ছেন যে বড়? আমি মিছি মিছি রাগ করি, আমিই ভয়ানক মন্দ লোক,—আর নিজে?" "কেন নলিনীর সাম্‌নে আমাকে অমন ক'রে অপমান ক'র্‌লেন, আবার আমাকেই শাস্তি দিতে না খেয়ে চ'লে যাচ্ছেন—কি ক'রেছি আপনার আমি?"—২২শ পরিচ্ছেদ। নরেন্দ্রনাথ আহারে বসিলে বিজয়া পাখা হাতে লইয়া তাহাকে বাতাস করিতে বসিল। ইহা ঠিক বাহিরের অতিথির সেবা নয়,—তার চেয়ে আরও কিছু বেশী,—অন্তরের অতিথির সেবাতেই এইরূপ ব্যবহার সম্ভব হয়।

খাইতে বসিয়া নরেন্দ্রনাথ অপরের নিন্দা করিলে বিজয়া তর্জ্জনী তুলিয়া কৃত্রিম (সত্যই আদরের) শাসন করার ভঙ্গীতে বলিল, আবার পরের নিন্দে। নরেন তাড়াতাড়ি খাওয়া শেষ করিতেই বিজয়া কহিল—'বাঃ—কিছুই ত খান নি, না এখন উঠ্‌তে পাবেন না, আচ্ছা না হয় পরের নিন্দে কর্‌তে কর্‌তেই অন্যমনস্ক হ'য়ে খান। আমি কিছু বল্‌ব না।' ইহাতে আদর অর্থাৎ আরও সোজা চল্‌তি কথায় যাহাকে সোহাগ বলে তারই সুর ধ্বনিত হইল।

আহার করিতে করিতে নরেন বলিল, "আপনার বাবা বেঁচে থাক্‌লে হয়ত, এ সময়ে আমার অনেক উপকার হ'তে পার্‌ত। তিনি নিশ্চয়ই আমাকে উঞ্ছবৃত্তি থেকে রেহাই দিতেন। আমাদের ঋণের সম্বন্ধে আপনাকে কি কখনো তিনি কিছু ব'লে যান নি?" এই কথায় বিজয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। ইহার পর নরেন কথাটাকে যতই চাপা দিতে চেষ্টা করিয়াছে বিজয়ার ঔৎসুক্য ততই বাড়িয়া চলিয়াছে। শেষে বিজয়া বলিল,—'আমি আর খোসামোদ ক'রতে পারি নে আপনাকে,—পায়ে পড়ি, বলুন।' বিজয়া বোধ হয় মনে করিয়াছে—তাহার পিতা মৃত্যুর পূর্ব্বে নরেনের বাড়ীর সম্বন্ধে তাহাকে যাহা বলিয়া গিয়াছিলেন তাহা বোধ হয় নরেন কোন প্রকারে জানিয়াছে এবং নরেনকে বাস্তুশূন্য করিয়া সে যে গর্হিত কাজ করিয়াছে তাহার বুঝি আর মার্জ্জনা নাই। শুধু তাই নয়,— নরেন্দ্রকে বাস্তুশূন্য করিবার সময় কিংবা বাস্তুশূন্য করিবার পর এতদিন কাটিয়া গেলেও নরেন্দ্র আপনি কোন দিন দেনার কথা উত্থাপন করে নাই, আজ তাহাকে নিজে দেনার কথা পাড়িতে দেখিয়া তাহার ঔৎসুক্য স্বভাবতঃ বাড়িয়াছিল। বিষয়-সম্পত্তি ছাড়া আর কোন কথা (যেমন তাহার বিবাহের কথা) নরেনের জ্ঞানগোচর হইয়াছে কি না তাহা জানিবার গোপন ইচ্ছাটাও তাহার অন্তরে উঁকি মারিতেছিল। নরেন যখন তাহার বাড়ীটা যৌতুক-স্বরূপ দানের কথা বলিল, তখন বিজয়া তাহাকে বাড়ীটা ফিরাইয়া দিতে চাহিল এবং নরেন না লইলেও সে তাহার পিসীর ছেলেকে দিতে চাহিল। নরেন যখন বলিল, যে, তাহার বাড়ীর দরকার নাই তখন বিজয়া তাহাকে বাড়ীর দাম দিতে চাহিল।

নরেন যখন বিজয়ার পিতার চিঠির উল্লেখ করিয়া জানাইল, যে, তাহাকেও পর্য্যন্ত দাবী করিবার ক্ষমতা তাহার আছে, তখন বিজয়া মুহূর্ত্তের জন্য একবার অত্যন্ত লজ্জিত হইলেও পরক্ষণেই আপনাকে সাম্‌লাইয়া লইয়া সেই চিঠি দু'খানি দেখিবার জন্য ব্যাকুল আগ্রহ জানাইল—যেন সেই

চিঠি দু'খানি দেখিয়া বাবার হস্তাক্ষরে প্রকৃত ইচ্ছাটা জানিয়া লইতে পারিলে সে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিবে এবং নরেনের হস্তেই প্রকাশ্যতঃ আত্ম-সমর্পণ করিয়া ফেলিবে। বিজয়া যে তাহার পিতার ইচ্ছা জানিত না তাহা নহে। বনমালী ত মৃত্যুর পূর্ব্বেই তাহাকে তাহার বিবাহের কথা জানাইয়া গিয়াছেন। তবে তিনি যাহার হাতে তাহার সমর্পণের কথা বলিয়া গিয়াছিলেন তাহার পক্ষ হইতে সে কোন প্রস্তাব বা দাবী জানিতে পারে নাই। আজই মাত্র সে জানিতে পারিয়াছে। তারপর পিতার ইচ্ছা জানিয়াও বিজয়ার নিজে নরেনের সহিত বিবাহের কথা কহাও সম্ভব ছিল না। প্রথম অবস্থায় বিলাসের প্রতি তাহার একটা টান ছিল, পরে তাহা একেবারে মন্দীভূত হইলেও, বিজয়া যে অবস্থা-সঙ্কটের মধ্যে পড়িয়াছিল তাহাতে তাহার আপনাকে সাম্‌লাইয়া লওয়া সম্ভব হইয়া উঠে নাই। রাসবিহারী ও বিলাস তাহার অভিভাবক ও সম্পত্তি দেখিবার কর্ত্তা। তাহার উপর ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠার দিনে রাসবিহারী বিলাসের সহিত বিজয়ার বিবাহের কথাটা পাড়িয়া সকলকে শুনাইয়া দিয়াছিলেন। বছরের প্রথম দিনে সেই কথাটা যেন আরও পাকাপাকি হইয়া গেল। বিজয়া বিলাসকে ভাল না বাসিলেও এবং নরেনকে আপনার অন্তরে দেবতা বলিয়া জানিলেও, সে রাসবিহারীর সঙ্ঘটিত অবস্থা-বিপর্যায়ের মধ্যে আপনার নারীসুলভ দুর্ব্বলতা ও নমনীয়তা একেবারে ঝাড়িয়া মুছিয়া ফেলিতে না পারিয়া আপনার একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও নিজের সহায়হীনতাকে মানিয়া লইয়াছিল। আপনার সহায়হীনতার বিরুদ্ধে রুদ্র মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইবার তাহার ক্ষমতা ছিল না, সে পৌরাণিক বিজয়া নহে। দুই একবার সে আপনার সহায়হীনতার বিরুদ্ধে রুদ্র মূর্ত্তি ধরিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিয়াছে বটে এবং কিছু পরিমাণ অগ্রসর হইয়াছেও বটে, কিন্তু পরক্ষণেই রাসবিহারীর পাকচক্র সে ভেদ করিতে না পারিয়া আপনার পূর্ব্ব অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে। কিন্তু সে আর একদিকে

অগ্রসর হইয়াছে, নরেনের প্রতি তাহার আগ্রহ ও প্রণয় ঘনীভূত হইয়াছে।

বিজয়া সহায়হীনা

বিজয়া যে নরেনকে ভালবাসিয়াছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। তবে বিজয়া নরেনকে ভালবাসিয়াছিল, কি, তাহার অজ্ঞাতসারে তাহার পিতার অভিপ্রায় পূর্ণ করিবার জন্য নরেনের উপর তাহার ভালবাসা পড়িয়াছিল তাহা ঠিক বলা যায় না। যাহাই হউক, সে যে নরেনের হাতে সমর্পিত তাহা নরেন এতদিনে জানিয়াছে—একথা বিজয়া কাল জানিতে পারিয়াছে। তার উপর রাসবিহারী যে তাহার উপর লক্ষ্য রাখিবার জন্য গোয়েন্দা নিযুক্ত করিয়াছেন তাহা সে জানিতে পারিয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছে। নরেনের নিকট তাহার পিতার চিঠি দু'খানির কথা শুনিয়া তাহার মন অনেকটা দৃঢ় হইয়াছিল। এই রাগটা আসিয়া আবার তাহাতে যোগ দিল। ইহাতে রাসবিহারীর মত ঘুঘু লোকের সহিত ঝগড়া করিতে সে খানিকটা বল পাইল। রাসবিহারী আসিয়া দলিল চাহিতেই বিজয়া তাহার ধূর্ত্তামি বুঝিতে পারিল এবং এই দলিল-চাওয়া লইয়াই রাসবিহারীর সহিত বিজয়ার বেশ খানিকটা ঝগড়া হইয়া গেল। সে-দিন বিলাসের সহিত তাহার যে ঝগড়া হইয়াছিল এ ঝগড়া তার চেয়ে কোন অংশে কম নয়। শেষে রাসবিহারী বিজয়ার চরিত্রের উপর কটাক্ষ করিয়া যে ভাবে তাহাকে অপমানিত করিলেন তাহাতে বিজয়া একেবারে নিস্তেজ হইয়া পড়িল। "বন্ধুর কর্ত্তব্য ব'লেই তোমার চলা-ফেরার প্রতি আমার নজর রাখ্‌তে হ'য়েছে। একটা অজানা অচেনা হতভাগাকে মাঠের মধ্যে থেকে ধ'রে এনে যে কাল সমস্ত বেলাটা কাটালে তার মানে কি আমি বুঝ্‌তে পারি নি? শুধু কি তাই? সে-দিন দুপুর রাত্রি পর্য্যন্ত তার সঙ্গে হাসি-তামাসা গল্প ক'রেও তোমার যথেষ্ট হ'ল না। সে রাত্রে কলকাতায় ফির্‌তে পার্‌লে না, ছল ক'রে তাকে এই খানেই থাক্‌তে হ'ল। এতে তোমার লজ্জা হয় না

বটে, কিন্তু আমাদের যে ঘরে-বাইরে মুখ পুড়ে গেল। সমাজে কারও সাম্‌নে মাথা তোল্‌বার জো রইল না", "এ সকল গুরুতর ব্যাপার, জবাব দেওয়া চাই।"—২৩শ পরিচ্ছেদ। বিজয়া ধীরে ধীরে বলিল—"ব্যাপার যত গুরুতর হোক্‌, মিথ্যে কথার আমি কি উত্তর আপনাকে দিতে পারি? শুধু এ যে মিথ্যে তাই আপনাকে বল্‌তে চাই এবং মিথ্যে ব'লে একে আপনি যে নিজেই সকলের চেয়ে বেশী জানেন তাও এই সঙ্গে আপনাকে জানাতে চাই।" বিজয়া সহায়হীনা—ইহার পরেও যখন রাসবিহারী কথা বাড়াইতে চাহিলেন তখন বিজয়ার আর যুদ্ধ করিবার প্রবৃত্তি রহিল না। সে উঠিয়া চলিয়া গেল।

নরেন্দ্রনাথের উপর বিজয়ার অবিশ্বাস ও উপায়হীনা হইয়া বিলাসের হাতে আত্মসমর্পণ

নরেন্দ্র নিজে না আসিয়া বিজয়ার পিতার চিঠি দু'খানি ডাকে পাঠাইয়া দেওয়ার জন্য বিজয়া ক্ষুব্ধ হইয়াছিল বটে, কিন্তু সে নরেনের উপর বিশ্বাস হারায় নাই। বেড়াইতে গিয়া যখন সে জানিল যে, নরেন বিজয়ার বাড়ীতে আসে না, অথচ রোজই দয়ালের বাড়ীতে আসে এবং নলিনীকে পড়াইয়া যায়—তখন বিজয়া জ্বলিয়া উঠিল। আপনার জিনিষ অপরে কাড়িয়া লইলে মানুষের মনের অবস্থা যেমন হয় বিজয়ার মনের অবস্থাও তাহাই হইয়াছিল। তার উপর আবার সে যখন শুনিল, যে, নরেনের সহিত নলিনীর বিবাহ দিতে দয়ালের আপত্তি নাই, আরও একটু ঘনিষ্ঠতা বাড়িলে তিনি কথাটা উত্থাপন করিবেন, তখন নরেনের উপর বিজয়াব অবিশ্বাস অনেকখানি বাড়িয়া গেল। তারপর বিজয়া দেখিল, নরেন আগ্রহের সহিত নলিনীকে পড়াইতেছে। সতীনের উপর রাগ করিয়া তাহার বিরুদ্ধে কিছু করিতে না পারিলে রাগটা যেমন অবস্থায় স্বামীর উপর গিয়া পড়ে, বিজয়ার অবস্থাটাও সেইরূপ হইল। তাই আজ বিজয়া নরেনকে

চিনিয়াও চিনিল না। অধিকন্তু এমন কথা বলিল যাহাতে নরেনকে অপমানিতই করা হইল।

বিলাসের সহিত বিজয়ার বিবাহ সম্বন্ধ যে স্থির তাহা নরেন জানে। তাহা সত্ত্বেও সে বিজয়ার পিতার প্রতিশ্রুতির উল্লেখ করিয়া প্রকারান্তরে তাহার নিজের সহিত বিজয়ার বিবাহের দাবী বিজয়াকেই জানাইয়া গিয়াছে। পত্র দু'খানি বিজয়াকে পাঠাইয়া দিয়াছে, অথচ বিজয়ার নিকট হইতে সে কিছুমাত্র জবাব পায় নাই। যে বিজয়া বাড়ী প্রত্যর্পণের প্রস্তাবে সেই মুহূর্ত্তেই সম্মতি দিয়াছিল এবং পিতার আদেশ পালনে তৎপর হইয়াছিল সেই বিজয়া তাহার বিবাহ-ব্যাপারে পিতার আদেশ পালনে সম্মতি জানাইতে বিলম্ব করিল কেন? বরং এই বিলম্ব দেখিয়াই নরেনের মনে করা স্বাভাবিক যে, বোধ হয় তাহার সহিত বিবাহ হওয়া বিজয়ার মনঃপূত নহে। সেইজন্য নরেন আর আসে নাই। এই অবস্থায় বিজয়ার উচিত ছিল, তাহার নিজেরই নরেনকে ডাকিয়া পাঠান, আর সে যখন নিজে জানে রাসবিহারীর দোষারোপ মিথ্যা তখন এ বিষয়ে তাহার ত কোন বাধা ছিল না। বাধা ছিল একটা—সেইটাই বড় বাধা—অর্থাৎ ধর্ম্মমতের পার্থক্য। অন্তরে সে ধর্ম্মমতের পার্থক্য না মানিলেও বাহিরে সামাজিকভাবে এত বড় বাধা ঠেলিয়া যাওয়া অন্যের সাহায্য ব্যতীত তাহার একলার পক্ষে অসম্ভব ছিল। নরেনের দিক দিয়াও এই বাধাটা ছিল। নরেন নিজে জাতিভেদ বা ধর্ম্মমতের পার্থক্য না মানিলেও, অন্যে তাহার মত সমান মত পোষণ করে কি না সে-বিষয়ে সে খোঁজ লয় নাই। তাই সে বিজয়ার নিকটে আপনার দাবীটা পুনরায় উত্থাপন করিতে পারিল না বা এ বিষয়ে তাহার মত কি তাহা জানিতে চাহিতেও সাহস করিল না। এই অবস্থায় কেহ যদি ব্রাহ্মমতেই হউক, আর হিন্দুমতেই হউক, তাহাদের মিলনটা ঘটাইয়া দেয় তাহা হইলে যেন সব দিক দিয়া সুন্দর হইয়া যায়।

নরেনের উপর বিজয়ার অবিশ্বাস আসিয়াছে, কিন্তু সে নরেনের আশা ঠিক ছাড়িতে পারে নাই বলিয়াই ছাড়ে নাই। সেইজন্য রাসবিহারী সহি

করিবার জন্য বিজয়ার সম্মুখে বিবাহের দলিল উপস্থাপিত করিতেই বিজয়া রাসবিহারীর আরোপিত দোষের উল্লেখ করিয়া বিলাসের সহিত বিবাহে তাহার অস্বীকৃতি জানাইল এবং তাহা এড়াইতে চাহিল। অথচ রাসবিহারী আপনার স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাহাকে চাপিয়া ধরিলেন। বিজয়ার ভয় ছিল—রাসবিহারী হতাশ হইলে তাহার নামে চারিদিকে মিথ্যা কলঙ্ক রটাইতে থাকিবে। এইরূপ সঙ্কটপূর্ণ অবস্থায় দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে সে বিবাহের দলিলে স্বাক্ষর করিয়া দিল।

নরেন্দ্র ও বিজয়া

সে-দিন দয়ালের বাড়ীতে নরেন্দ্র বিজয়ার নিকট হইতে যে ব্যবহার পাইয়াছে তাহাতে নরেনের আর বিজয়ার উপর আগ্রহ না থাকিবারই কথা। কারণ সে বিজয়ার পিতার চিঠি দু'খানি তাহার নিকট পাঠাইয়া দিয়াও সম্মতি-সূচক কোন প্রকার লক্ষণই দেখিতে পায় নাই, অধিকন্তু সে এই ব্যবহার লাভ করিল। তারপর সে বিলাসের সহিত বিজয়ার নিমন্ত্রণ-পত্র পাইল। কাজেই এই অবস্থায় তাহার বিজয়ার সম্বন্ধে আশাশূন্য হওয়ারই কথা। নিমন্ত্রণ-পত্র যখন বিতরণ হইয়া গেল তখন আখ্যায়িকা যে নামের সহিত সামঞ্জস্য না রাখিয়া এইখানে শেষ হইয়া যাইবে তাহা স্বতঃই পাঠকের মনে জাগে। অবশ্য আখ্যায়িকা এইখানেই শেষ হইবে একথা সত্য, কিন্তু একটু আশাতীত সাফল্যের সহিত। নিপুণ শিল্পী আখ্যায়িকা আর অধিক না বাড়াইয়া (কেননা বিবাহ যাহার সঙ্গে হউক না কেন, নিমন্ত্রণ-পত্র বিতরণ হইয়া গিয়াছে) অতি কৌশলে সংক্ষেপে সহজভাবে সামঞ্জস্য সাধন করিলেন।

নরেন্দ্র ও বিজয়ার মধ্যে সম্বন্ধটা ধাপে ধাপে ঘনিষ্ঠ, ঘনিষ্ঠতর, ঘনিষ্ঠতম অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছিল। এই সম্বন্ধটা স্মরণ করিয়া শেষ দেখা করিয়া যেন স্মৃতিটুকু শেষ সম্বল করিয়া লইয়া যাইবার জন্যই নরেন্দ্র দেশত্যাগের পূর্ব্বে বিজয়ার সহিত অযাচিতভাবে দেখা করিতে আসিল

এবং কোন প্রকার খবর না দিয়াই সে একেবারে উপরে উঠিয়া গেল। কথায় কথায় যখন প্রকাশ পাইল যে, নলিনীর উপর নরেনের কিছুমাত্র লোভ নাই, তখন বিজয়া আপনার সে-দিনের ভুল বুঝিতে পারিল এবং আপনার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য নরেন যে তাহার অনুমতি ব্যতীত চলিয়া যাইতে পারে না, সেই কথাটাও সে পরোক্ষভাবে আদেশের সুরে জানাইয়া দিল।

বিজয়ার আদেশ নরেন এড়াইতে পারিবে কেন? হৃদয়ের মিলন হইয়া গিয়াছে, মিলনের বাধা চুকিয়া গিয়াছে, অথচ মিলন সামাজিকভাবে ঘটিবার কোন সুষ্ঠু উপায় নাই। অসামাজিকভাবে মিলন দেখিতে খারাপ, শুনিতেও ভাল নয়। গ্রন্থকার এতটা বাড়াবাড়ি সাহস করেন নাই। ব্রাহ্ম-সমাজের উপর তাঁহার কোন প্রকার বিরাগের কারণ আছে, বা ছিল কি না জানি না। যাহাই হউক, এখন সামাজিকভাবে মিলন ঘটাইবার পক্ষে আর একজনের দরকার। নরেনের পক্ষ হইতে কেহ নাই, সে ত একঘরে। বিজয়ার পক্ষ হইতে রাসবিহারী ও বিলাসবিহারী আছেন, নাম না করাই ভাল। কাজেই ব্রাহ্ম-সমাজের আচার্য্যের মধ্যস্থতায় শুভবিবাহটা সম্পন্ন হইল কেবলমাত্র বিশুদ্ধ হিন্দুমতে।

নরেন্দ্র

নরেন্দ্র যখন তাহার মামার হইয়া বিজয়ার নিকটে দুর্গাপূজা করিবার অনুমতি লইতে আসিয়াছিল তখনই নরেন্দ্রের সহিত আমাদের প্রথম দেখা। তখন কেবলমাত্র দুর্গাপূজা-সংক্রান্ত ব্যাপার লইয়া বিজয়ার সহিত তাহার কথাবার্ত্তা হইয়াছে। তখন কেহ কাহারও নিকটে পরিচিত ছিল না। তা' ছাড়া নরেন্দ্রনাথ এমন অবস্থায় ও এমন ভাবে আসিয়া কথা বলিতে আরম্ভ করিয়া দিয়াছিল যে, তখন তাহার নাম জিজ্ঞাসা করিবার খেয়াল বিলাস বা বিজয়া কাহারও হয় নাই। তখন বিজয়ার সহিত নরেন্দ্রনাথের যে কথাবার্ত্তা হইয়াছে তাহাতে নরেন্দ্রনাথের সারল্য, অহঙ্কারশূন্যতা ও পরোপকার-প্রবৃত্তি প্রকাশ পাইয়াছে।

তারপর নদীতীরে বিজয়ার সহিত নরেন্দ্রনাথের সাক্ষাৎ। যখন পরিচয় দিবার সময় আসিল তখন নরেন্দ্র কোনমতে আপনাকে গোপন করিয়া ফেলিল। অবশ্য, বিজয়ার দিক হইতে বোকামি হউক্, ভুল হউক্, সাহসের অভাব হউক্ বা নারীসুলভ সঙ্কোচবোধ হউক্,—তাহার দিক হইতে নরেন্দ্রকে তাহার নামটা জিজ্ঞাসা করা হইল না। তারপর যে সমস্ত কথা হইল তাহা সবই নরেন্দ্রনাথকে কেন্দ্র করিয়া। এত কথার মধ্যে নরেন্দ্র ত আপনার পরিচয় দিতে পারিত, এখানে কি তবে তাহার সৎ-সাহসের অভাব হইয়াছে? না, তাহা নহে, নরেন্দ্রনাথের সাহস আছে—সৎ-সাহসই আছে। বিজয়া তাহাকে যে প্রশ্ন করিয়াছে নরেন্দ্র সেই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছে। তাহার মধ্যে সে যাচিয়া আপনার পরিচয় দিবার দরকার মনে করে নাই। আর সত্যই ত! যাচিয়া পরিচয় দিয়াই বা লাভ কি? বিজয়া প্রশ্ন করিল, তিনি (নরেন্দ্র) কি রকম লোক ব'ল্‌তে পারেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে নরেন্দ্র যাহা বলিয়াছে, তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, সে ইচ্ছা করিয়াই যেন আপনাকে গোপন রাখিতে চায়। সেই সঙ্গে সে ইহাও জানিতে চায়—তাহার নিজের সম্বন্ধে বিজয়ার অভিমত কি? পরদিন বিজয়ার সহিত নরেন্দ্রনাথের দেখা হইতেই যে কথার অবতারণা হইল, তাহাতে আপনা হইতেই নরেন্দ্রনাথের কথাটা আসিয়া পড়িল। তা' ছাড়া বিজয়াও পূর্ব্ব হইতে নরেন্দ্রনাথের কথা শুনিবার জন্য বিশেষ আগ্রহবতী ছিল। আজও সমস্ত কথাবার্ত্তার মধ্যে নরেন্দ্র আপনাকে লুকাইতে চেষ্টা করিল। কথাবার্ত্তার মধ্যে অপরিচিত নরেন্দ্র বলিল, একদিন হয়ত সে (নরেন্দ্র) আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে যাবে। এই কথায় বিজয়া নরেন্দ্রনাথের বিষয়ে কোন ঔৎসুক্য প্রকাশ করে কি না বা তাহার সম্বন্ধে কিছু জানিতে চায় কি না—এই সব অবগত হইবার জন্য নরেন্দ্র ঐরূপ বলিয়াছিল। তবে নরেন্দ্রনাথ যদি কথাচ্ছলে আপনার সত্য ইচ্ছাটা প্রকাশ করিয়া থাকে, তবে এই প্রশ্ন করিতে সকলেরই স্বতঃই ইচ্ছা হয় যে, যে নরেন্দ্রনাথ আজ বিজয়ার সাম্‌নে এমন-ভাবে লুকাইয়া চলিতেছে সেই নরেন্দ্রনাথ বিজয়ার সহিত দেখা করিতে যাইবে কেন? সে-দিন কি বিজয়ার সহিত তাহার আলাপ হইতে বাকী থাকিবে? নরেন্দ্রনাথ বিজয়ার সহিত কেন দেখা করিতে যাইবে—ইহাতে গ্রন্থকার পাঠকের কৌতূহল বৃদ্ধি করিয়া আপনি কৌশলে উত্তরটা এড়াইয়া গিয়াছেন।

তারপর একদিন সত্যই অপরিচিত নরেন্দ্র বিজয়ার সহিত দেখা করিতে আসিল। বিজয়ার সহিত প্রথম হইতে যে কথা আরম্ভ হইল তাহাও নরেন্দ্রকে কেন্দ্র করিয়া। নরেন্দ্রও আপনাকে গোপন করিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিল। কিন্তু বেশী ক্ষণ সে-ভাবে থাকিতে পারিল না। বিজয়ার নিকট পরিচয় প্রকাশ পাইল। পূর্ব্ব দিনের মত নরেন্দ্র তাহার বাপের দেনার সম্বন্ধে বিজয়ার অভিমত জানিতে চায়। কিন্তু যখন সে কথা এক রকম শেষ হইয়া গেল, বিজয়া কহিল, আপনি কি জন্য এসেছিলেন সে

তো ব'ল্লেন না। নরেন্দ্র তার উত্তরে বলিল, সে থাক্। তাহা হইলে বুঝিতে হয়—নরেন্দ্র কিছু একটা উদ্দেশ্য লইয়া বিজয়ার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছিল। নরেন্দ্রকে যতখানি সংসারানভিজ্ঞ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে নরেন্দ্র বাস্তবিক পক্ষে ততখানি অনভিজ্ঞ নয়।

চলিয়া যাইবার সময় বিজয়া নরেন্দ্রকে আহারাদির জন্য জিদ করিল। নরেন্দ্রও থাকিয়া গেল। এই থাকিয়া যাওয়ার পশ্চাতে আবশ্যকতা যতটুকুই থাকুক্ না কেন—বিজয়ার সম্বন্ধে আরও কিছু জানিবার জন্য নরেন্দ্র নিশ্চিতই উৎসুক ছিল। খাইতে বসিয়া নরেন্দ্র যে ভাবে টিপিয়া টিপিয়া কথা বলিয়াছে তাহাতে তাহার একটা গোপন ইচ্ছাই লক্ষিত হয়। 'এ কিছু আর যথার্থই সত্যি হ'তে পারে না। সে আমিও জানি, আপনিও জানেন, বরঞ্চ একে সত্যি বল্লেই আপনাকে ব্যঙ্গ করা হবে—অথচ মিথ্যে ব'লে ভাব্‌তেও যেন ইচ্ছে করে না।'—১১শ পরিচ্ছেদ। নরেন্দ্রনাথের এই কথার মধ্যে আর যাহাই প্রকাশ হউক্ না কেন—ইহা নিছক সরলতা ও অনভিজ্ঞতার পরিচয় নহে। ইহার মধ্যে কিছু একটা কৌশলে জানিবার গোপন ইচ্ছার আভাস পাওয়া যায়। বিদায় লইবার সময় নরেন্দ্র বলিয়া গেল, আপনার মন্দিরের দিন দিন শ্রীবৃদ্ধি হোক্, আর সেই সঙ্গে বলিয়া গেল—আজকের দিনটা আমার চিরকাল মনে থাক্‌বে। প্রথম কথার মধ্যে যে-ভাবে প্রচ্ছন্ন ব্যঙ্গ (irony) লক্ষিত হইতেছে, সেইভাবে দ্বিতীয় কথার মধ্যে, নরেন্দ্র যে বিজয়ার ব্যবহার ও মনের গতি লক্ষ্য করিয়াছে, তাহাও প্রকাশ পাইতেছে।

পরদিন নরেন্দ্রনাথ মাইক্রস্কোপ লইয়া বিজয়ার সহিত দেখা করিতে আসিল। বিজয়াও তাহার আসিবার জন্য পথ চাহিয়া ছিল এবং প্রস্তুত ছিল। বিজয়া একটু সাজিয়া-গুজিয়া নরেন্দ্রের নিকটে আসিয়াছে। বিজয়া সম্মুখে আসিতেই নরেন্দ্র বলিয়া ফেলিল, "আপনাকে ত আমি আরও কয়েকবার দেখেছি। কিন্তু আজ আপনি ঘরে ঢুক্‌তেই আমার

চোখ খুলে গেল। আমি নিশ্চয়ই ব'ল্‌তে পারি, যে ছবি আঁক্‌তে জানে তারই আপনাকে দেখে আজ লোভ হবে! বাঃ কি সুন্দর!"—১১শ পরিচ্ছেদ। বিজয়ার সহিত নরেন্দ্রের তিন চারি দিনের দেখা এবং মাত্র একদিনের আলাপ। এই একদিনের আলাপে নরেন্দ্রের পক্ষে একজন শিক্ষিতা ভদ্রমহিলার সম্মুখে তাহারই সম্বন্ধে এই প্রকার উক্তি একটু বাড়াবাড়ি বলিয়াই মনে হয়। কেননা নরেন্দ্র সংসার-অনভিজ্ঞ নয়, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। কাজেই তাহার শীলতা বা ভব্যতা জ্ঞান আছে। তবে এই উক্তি ন্যায় কি অন্যায়, আমরা এখানে তাহার আলোচনা করিব না। নরেন্দ্রনাথের এই উক্তি পূর্ব্ব-চিন্তিত (Pre-meditated) নয়। ইহা নরেন্দ্রনাথের আর এক পা অগ্রসর হইবার অজ্ঞাত চেষ্টা, ইহা ঠিক অসঙ্গত নহে। তবে আপাততঃ যখন একদিক দিয়া একটু বাড়াবাড়ি হইয়া গেল তখন তাহাকে একটু শাস্তি পাইতে হইল। "বিজয়া কহিল, আমাকে এ-রকম অপ্রতিভ করা কি আপনার উচিত? তা' ছাড়া একটা জিনিষ কিন্‌ব ব'লেই আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছিলাম, ছবি আঁক্‌বার জন্য ত ডাকিনি। জবাব শুনিয়া নরেনের মুখ শুকাইল। সে লজ্জায় একান্ত সঙ্কুচিত ও কুণ্ঠিত হইয়া অস্ফুট-কণ্ঠে এই বলিয়া ক্ষমা চাহিতে লাগিল যে, সে কিছুই ভাবিয়া বলে নাই—তাহার অত্যন্ত অন্যায় হইয়া গিয়াছে—আর কখনো সে—ইত্যাদি ইত্যাদি।"—১১শ পরিচ্ছেদ।

ইহার পর নরেন্দ্র বিজয়াকে অনেক ক্ষণ ধরিয়া মাইক্রস্কোপ দেখাইয়াছে। বিজয়া মাইক্রস্কোপ লইবে না মনে করিয়া নরেন্দ্র সেটা লইয়া উঠিতে চাহিল। তাহাতে বিজয়া কহিল—ওটা আপনার ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে না। এইখানেই থাক্‌বে। নরেন্দ্র দুই একটি কথার পর বলিল—"আপনি কেন্‌বার ছলে আনিয়ে আট্‌কাতে চান? এও কি বাবা আপনার কাছে বাঁধা রেখেছিলেন? আপনি তা'হলে দেখ্‌ছি আমাকেও আট্‌কাতে পারেন। বাবা আমাকেও আপনার কাছে বাঁধা দিয়ে গেছেন।"—

১১শ পরিচ্ছেদ। বিজয়া ও নরেনের ভবিষ্যৎ মিলনের এই অজ্ঞাত ইঙ্গিত লক্ষণীয়।

তারপর বিদায় লইবার সময় নরেন্দ্র অন্যান্য কথার মধ্যে বলিল, আপনাকে আমার সর্ব্বদা মনে পড়্‌বে। ইহার পর নরেন্দ্র যে কাণ্ড করিয়া বসিল তাহা প্রথম বারের অপেক্ষা আরও বাড়াবাড়ি। অকস্মাৎ হাত বাড়াইয়া বিজয়ার চিবুক তুলিয়া ধরিয়া সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল—"একি আপনি কাঁদ্‌ছেন?"—১২শ পরিচ্ছেদ। বিজয়ার সহিত নরেন্দ্রনাথের এখনও এমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয় নাই যাহাতে সে বিজয়ার চিবুক ধরিতে পারে। নরেন্দ্রই এ বিষয়ে যথার্থ অধিকারী, অন্য কেহ নহে, কিন্তু তখনও নরেন্দ্র এ অধিকার পায় নাই। শরৎচন্দ্র নরেন্দ্রকে 'কাণ্ডজ্ঞান-বর্জ্জিত বৈজ্ঞানিক' বলিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন।

বিজয়া নরেন্দ্রকে যতখানি বুঝিতে পারিয়াছিল নরেন্দ্র বিজয়াকে ততখানি চিনিতে পারে নাই। বিজয়া যখন অনাবিল রসিকতা করিবার অভিপ্রায়ে বলিতেছিল "আপনার মাথাটা তার চেয়েও শক্ত। ঢুঁ মার্‌লে—" "আচ্ছা, আপনি ত ডাক্তার, আপনি হাত দেখ্‌তে জানেন?" "নইলে আপনার গায়ে জোর আছে এবং হাতে লাঠি আছে" ইত্যাদি (১৫শ পরিচ্ছেদ) তখন নরেন্দ্র রাগিয়া উঠিয়াছিল। বিজয়া নরেন্দ্রকে হীনভাবে উপহাস করিবার উদ্দেশ্যে কোন কথা বলে নাই, কেবল তাহার দু'একটা কথা উপহাসের মত শুনাইতেছিল। বিজয়া নরেন্দ্রকে মাইক্রস্কোপটা ফিরাইয়া দিতে অস্বীকার করায় নরেন্দ্র চটিয়া গিয়াছে। তাহার উপর এই উপহাসের সুর তাহার কর্ণমূলে লাগিয়াছে। কাজেই নরেন্দ্রনাথের রাগান্বিত হওয়া স্বাভাবিক। কিন্তু তবুও কেন নরেন্দ্র উঠিয়া চলিয়া যাইবার চেষ্টা করিয়া যাইতে পারিল না, বসিয়া পড়িল? যে বিজয়া এমনিভাবে তাহাকে উপহাস করিতেছে বলিয়া সে রাগান্বিত হইয়াছে,

সেই বিজয়ার কথায় সে আবার অপেক্ষা করিল, সেই বিজয়ার জ্বর হইয়াছে দেখিয়া সে অযাচিতভাবে বলিল, "কাল পরশু আবার আমি আস্‌ব।" নরেন্দ্র পরদুঃখকাতর—এ কথা ঠিক, কিন্তু সে মনে মনে জানে বিজয়া তাহাকে উপহাস করিয়াছে। মাইক্রস্কোপের ব্যাপারে সে হতাশ হইয়াছে। সে ডাক্তার, বিজয়া তাহাকে ডাক্তার হিসাবেও ডাক দেয় নাই, তবুও কেন সে অযাচিতভাবে আসিয়া বিজয়াকে দেখিয়া যাইতে চায়। বিজয়াকে লাভ করিয়া সে একেবারে অঙ্কগতা করিয়া ফেলিবে এমন দুরন্ত বাসনা তাহার মনের কোণে উঁকি না মারিলেও বিজয়ার প্রতি তাহার একটা টান আছে—যে টান সে কিছুতেই এড়াইয়া চলিতে পারিতেছে না। অবশ্য এমন টান হওয়াটা কিছু অযৌক্তিক নয় এবং স্থল-ও সময়বিশেষে মঙ্গলজনকই বটে। একদিন পরে বিজয়াকে দেখিতে আসিয়া সে বিজয়ার ঘরে বিজয়ারই সম্মুখে বিলাস ও রাসবিহারী কর্তৃক অপমানিত হইয়াছে। কিন্তু তবুও আজ বিজয়ারই কাতর অনুরোধে স্নানাহারের কথা ভুলিয়া প্রচণ্ড রোদ মাথায় করিয়া, যেখানে না গেলে বা যে কাজ না করিলে তাহার চলিত এবং সেজন্য বাহিরে কাহারও নিকটে তাহাকে জবাবদিহি করিতে হইত না, সে সেই স্থানের উদ্দেশ্যে সেই কাজ করিবার জন্য চলিল। ইহা নিছক পরোপকার-প্রবৃত্তি, না, প্রণয়াসক্তি? নরেন্দ্রনাথের পক্ষে উভয়ই সত্য।

নরেন্দ্রনাথ অজ্ঞাতসারেই বিজয়াকে ভালবাসিয়া ফেলিয়াছিল। নরেন্দ্র জানিত না যে, বিলাসের সহিত বিজয়ার বিবাহ-সম্বন্ধ এক-প্রকার স্থির হইয়া গিয়াছে। একথা পূর্ব্বে জানিলে সে নিশ্চিতই অযাচিতভাবে বিজয়াকে দেখিতে যাইত না। রাসবিহারীর সহিত কথাবার্ত্তায় সে জানিল, বিলাসের সহিত বিজয়ার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইয়া গিয়াছে। তবুও সে বিজয়ার কথাগুলি স্মরণ করিয়া দয়ালকে দেখিতে চলিল। দয়ালকে দেখিতে গিয়াও সে জানিল, বিলাসের সহিত বিজয়ার

বিবাহ-ব্যাপার স্থির। তাই বিজয়ার উপর তাহার একটা ঘৃণা ও বিরক্তির ভাব জাগিল, সেই সঙ্গে বিজয়ার প্রেরিত কালিপদকে দেখিয়া ও তাহার মুখ হইতে সেই মাইক্রস্কোপের কথা শুনিয়া সে রাগে জ্বলিয়া উঠিল। বিজয়ার কথা স্মরণ করিয়াই সে হয়ত কালিপদর নিকট হইতে মাইক্রস্কোপটা লইতে পারিত। কিন্তু কালিপদর মুখ হইতে সে বিজয়ার দয়ার ইঙ্গিত জানিতে পারিল। একে ত সে অপমানিত হইয়া আসিয়াছে, তাহার উপর এই কৃপাপ্রদর্শন! তাহার কি আর-একটা মাইক্রস্কোপ কিনিবার টাকা নাই, যে, সে বিজয়ার নিকট হইতে বিনামূল্যে জিনিষটা লইবে। তাহার রাগ আরও চড়িয়া গেল। রাগ করিলেই বা কি হইবে? বিজয়া ত সম্মুখে নাই। কাহার উপরে গিয়া রাগটা পড়িবে? কালিপদ যতদূর সম্ভব ভদ্রভাবে এবং মোলায়েম সুরে নরেন্দ্রনাথের সহিত কথা বলিয়াছে, তবুও নরেন্দ্রনাথের রাগ থামে নাই। তাহার রাগ গিয়া পড়িল কালিপদর উপর। 'বেরো সাম্‌নে থেকে বল্‌ছি—পাজি নচ্ছার কোথাকার!' আজ নরেন্দ্রের জ্ঞানোদয় হইয়াছে, তাই সে আপনার অপমান সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াছে। মনের মধ্যে দুর্য্যোগের মুহূর্ত্তে সে মাইক্রস্কোপটা গ্রহণ করিল না। ইহাতে বিজয়ার প্রতি না জানিয়া যতটুকু অবিচার হইবার হইয়া গেল, কিন্তু ইহাও লক্ষ্য করিতে হইবে যে, সে বিজয়ার সম্বন্ধে কোন মন্তব্য প্রকাশ করিল না।

বিজয়ার প্রতি নরেন্দ্রনাথের প্রণয়বৃদ্ধি

পূর্ব্বে নরেন যেন অজ্ঞাতসারেই বিজয়াকে ভালবাসিয়াছিল। কিন্তু এবার সে জ্ঞাতসারেই তাহাকে ভালবাসিল। "আট দশ দিন বোধ করি চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তেইশ ঘণ্টা শুধু আপনাকেই ভাব্‌তুম, আর আপনার অসুখের সেই কথাগুলোই (কাল এলে ত আজ আমার এত জ্বর হ'ত না—আমি সমস্ত দিন পথপানে চেয়েছিলুম। আমি ভাল না হওয়া পর্য্যন্ত

তুমি কোথাও যাবে না বল—তুমি চ'লে গেলে আমি হয়ত বাঁচ্‌ব না) মনে পড়্‌ত। কাজকর্ম্ম চুলোয় গেল—দিবারাত্রি আপনার কথাই শুধু মনের মধ্যে ঘুরে বেড়ায়। দু'তিন দিন এই পথে অনর্থক হেঁটে গেছি কেবল আপনাকে দেখ্‌বার জন্যে।"—২০শ পরিচ্ছেদ। নরেনের অন্তরতম প্রদেশ হইতে কে যেন বলিয়া দিতেছিল, বিজয়া ত তাহাকে অপমানিত করে নাই ; বরং সে-ই ত তাহাকে আর অধিক অপমানিত হইতে না দিয়া চলিয়া আসিতে অনুরোধ করিয়াছিল। বিজয়ার সহিত দেখা করিতে আসিবার বাহ্যতঃ কোন কারণ নরেনের ছিল না, ইচ্ছা থাকিলেও সে আসিবার জন্য বিশেষ স্বস্তিবোধ করিতেছিল না, কিন্তু সে দয়ালের নিকট হইতে সব শুনিয়াছে। বিজয়া যে তাহার সে-দিনকার অপমানের কথা ভুলে নাই এবং সে যে বিলাসকে তাহার অতিরিক্ত বাড়াবাড়ির জন্য রূঢ় কথায় অপমানিত করিয়াছে তাহাও সে জানিয়াছে। তাই নরেন উল্লাসের সহিত বিজয়ার সঙ্গে বিনা কারণে দেখা করিতে আসিতে সাহস ও স্বস্তিবোধ করিতেছে।

বৈশাখের প্রথম দিনে বিজয়া পরেশকে দিয়া নরেন্দ্রকে মাঠের মধ্য হইতে ডাকাইয়া আনিল। আহারে বসিয়া নরেন্দ্র যে-ভাবে বিজয়ার সহিত কথা বলিতেছে তাহা লক্ষ্য করিবার বিষয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নরেন্দ্র একেবারে সংসারানভিজ্ঞ নয়, তা'ছাড়া তাহার অজ্ঞাত ছিল—সংসারের এমন অনেক জিনিষ এখন তাহার জ্ঞানগোচর হইয়াছে। সে খুব সাবধানে বিজয়ার সহিত কথা বলিতেছে, কথা বলিতে বলিতে সে কৌশলে বিজয়ার পিতার চিঠির কথা উল্লেখ করিল এবং এই বিষয়ে বিজয়ার অভিমত কি তাহাই জানিবার জন্য উৎসুক হইয়া রহিল। বিজয়ার স্পষ্ট অভিমত বুঝা গেল না। তবে চিঠি দু'খানি দেখিবার জন্য খুব আগ্রহ লক্ষিত হইল।

বিলাসের সহিত বিজয়ার বিবাহ-সম্বন্ধ যে স্থির তাহা নরেন্দ্র জানিয়াছিল। তাহা সত্ত্বেও সে বিজয়ার পিতার প্রতিশ্রুতির উল্লেখ

করিয়া প্রকারান্তরে তাহার নিজের সহিত বিজয়ার বিবাহের দাবী বিজয়াকেই জানাইয়া গিয়াছিল। সে পত্র দু'খানি বিজয়াকে পাঠাইয়া দিয়াছে, অথচ বিজয়ার নিকট হইতে সে কিছুমাত্র জবাব পায় নাই। যে বিজয়া বাড়ী প্রত্যর্পণের প্রস্তাবে সেই মুহূর্ত্তেই সম্মতি দিয়াছিল এবং পিতার আদেশ পালনে তৎপর হইয়াছিল, সেই বিজয়া তাহার বিবাহ-ব্যাপারে পিতার আদেশ পালনে সম্মতি জানাইতে বিলম্ব করিল কেন? বরং এই দেরী দেখিয়াই নরেনের মনে করা স্বাভাবিক যে, বোধ হয় তাহার সহিত বিবাহ হওয়া বিজয়ার মনঃপূত নহে, সেইজন্য নরেন আর আসে নাই। বিজয়া ও নরেনের মধ্যে প্রচলিত ধর্ম্মমতের পার্থক্যের বাধা ছিল। নরেন নিজে জাতিভেদ বা ধর্ম্মমতের পার্থক্য না মানিলেও অন্যে তাহার মত সমান মত পোষণ করে কি না তাহা সে জানে না, তাই সে বিজয়ার নিকট আপনার দাবীটা পুনরায় উত্থাপন করিতে পারিল না বা এ বিষয়ে তাহার মত কি তাহা জানিতে চাহিতেও সাহস করিল না।

সে-দিন দয়ালের বাড়ীতে নরেন্দ্র বিজয়ার নিকট হইতে যে ব্যবহার পাইয়াছে তাহাতে বিজয়ার উপর নরেনের আর আগ্রহ না থাকিবারই কথা। "নরেন্দ্র তাড়াতাড়ি চৌকি ছাড়িয়া উঠিয়া নমস্কার করিয়া জিজ্ঞাসা করিল,—ভাল আছেন? বিজয়া নমস্কারও ফিরাইয়া দিল না, প্রশ্নেরও উত্তর দিল না। যেন দেখিতেই পায় নাই, এমনি ভাবে তাহার প্রতি সম্পূর্ণ পিছন ফিরিয়া নলিনীকে কহিল, কৈ, আপনি ত আর একদিনও গেলেন না? নরেন সুমুখে আসিয়া হাসিমুখে কহিল, আর আমাকে বুঝি চিন্‌তেও পার্‌লেন না? বিজয়া শান্ত অবজ্ঞার সহিত জবাব দিল, চিন্‌তে পার্‌লেই চেনা দরকার না কি?"—২৪শ পরিচ্ছেদ। চলিয়া যাইবার সময় "বিজয়া তাহাকে কোন প্রকার সম্ভাষণ না করিয়া, এমন কি, দৃক্‌পাত পর্য্যন্ত না করিয়া, ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।" নরেন্দ্র বিজয়ার পিতার চিঠি দু'খানি বিজয়ার নিকটে পাঠাইয়া দিয়াও

সম্মতিসূচক কোন প্রকার লক্ষণই দেখিতে পায় নাই, অধিকন্তু সে এই ব্যবহার পাইল। তারপর সে বিলাসের সহিত বিজয়ার বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্র পাইল। কাজেই এই অবস্থায় তাহার বিজয়ার সম্বন্ধে আশাশূন্য হওয়ারই কথা।

নরেন্দ্র ও বিজয়ার মধ্যে সম্বন্ধটা ধাপে ধাপে ঘনিষ্ঠ অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছিল। এই সম্বন্ধটা স্মরণ করিয়া শেষ দেখা করিয়া যেন স্মৃতিটুকু শেষ সম্বল করিয়া লইয়া যাইবার জন্যই নরেন্দ্র দেশত্যাগের পূর্ব্বে বিজয়ার সহিত অযাচিতভাবে দেখা করিতে আসিল এবং কোন প্রকার খবর না দিয়াই সে একেবারে উপরে উঠিয়া গেল। কথায় কথায় যখন প্রকাশ পাইল, যে, নলিনীর উপর নরেনের কিছুমাত্র লোভ নাই তখন বিজয়া আপনার সে-দিনের ভুল বুঝিতে পারিল এবং আপনার ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করিবার জন্য, নরেন যে তাহার অনুমতি ব্যতীত চলিয়া যাইতে পারে না, সেই কথাটাও সে পরোক্ষভাবে আদেশের সুরে জানাইয়া দিল।

নরেন্দ্র বিজয়ার আদেশ এড়াইতে পারে না।

বিলাস
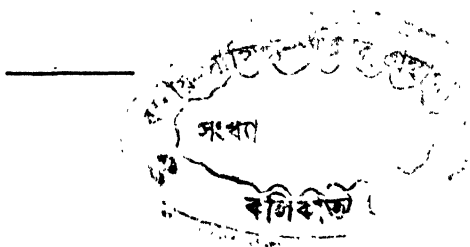
বিলাস সুদর্শন, 'সে বেঁটে, মোটা এবং ভারী যোয়ান। তাহার বুকের পাঁজর বোমা মারিয়া নির্দ্দেশ করা যাইত না।'—৩য় পরিচ্ছেদ। বিলাস ও বিজয়া উভয়েই ব্রাহ্ম-সমাজের, সহরে থাকিয়া মানুষ হইয়াছে, ইংরাজী ধরণে উচ্চশিক্ষা পাইয়াছে। বিলাস বিজয়ার বাটীতে 'আসা-যাওয়া' করে। এই 'আসা-যাওয়া' লইয়া বিজয়ার সহিত বিলাসের ভাব হয়। বিজয়ার প্রতি যে বিলাসের আকর্ষণ ছিল তাহা তাহার চাটুবাক্যের মধ্য দিয়াই প্রকাশ পাইয়াছে। বনমালী ও জগদীশের মৃত্যুর পর বিলাস জগদীশের ঘর-বাড়ী দেনার দায়ে দখল করিয়া ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা উত্থাপন করিল। বিলাস বলিল, 'আমি মনে ক'রেছি, তার বাড়ীটায় আপনার নাম ক'রে যা কোথাও নেই, কোথাও হয়নি—আমি তাই ক'র্‌ব। যাকে তারা নির্য্যাতন ক'রে দেশ থেকে বিদায় ক'রে দিয়েছিল সেই মহাত্মারই মহীয়সী কন্যা তাদেরই মঙ্গলের জন্য এই বিপুল স্বার্থত্যাগ ক'রেছেন, প্রজাদের একবার তাদের মহারাণীকে দেখ্‌তে দিন,—আমার ত নিশ্চয়ই মনে হয় এ সৌভাগ্য থেকে তাদের বঞ্চিত করা মহাপাপ।'—৩য় পরিচ্ছেদ।

বিজয়ার নিকটে ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠার কথা বলিতে বলিতে 'এই নোব্‌ল্ প্রতিশোধ নিয়ে তাদেরই এই চরম উপকার করা,' 'সমস্ত ভারতবর্ষময় কি একটা মর‍্যাল এফেক্‌ট্ হবে, বলুন দেখি,' বলিয়া বিলাসবিহারী সম্মুখের টেবিলের উপর একটা প্রচণ্ড চাপড় মারিল।—৩য় পরিচ্ছেদ। শরৎচন্দ্রও বোধ করি 'নোব্‌ল্ প্রতিশোধ' লইবার উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজের উপর একটা প্রচণ্ড চাপড় মারিয়া লইলেন।

নরেন্দ্রনাথের মামার বাড়ীতে দুর্গাপূজা বন্ধ করিয়া দেওয়ার পক্ষে বিলাসের যে যুক্তি ছিল তাহাও লক্ষণীয়। "শুধু কতকগুলো ঢাক-ঢোল-

কাঁসি অহোরাত্র ওঁর কানের কাছে পিটে ওঁকে অসুস্থ ক'রে তোলাতেই আমাদের আপত্তি। কল্‌কাতা থেকে ওঁকে দেশে আনিয়ে মিছামিছি একরাশ ঢোল-কাঁসর বাজিয়ে ওঁর কানের মাথা খেয়ে ফেল্‌তে আমরা দেব না—কিছুতেই না।"—৪র্থ পরিচ্ছেদ। বিলাস নরেন্দ্রের দুর্গাপূজার অনুমতির প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিল অথচ সে এ বিষয়ে কোন প্রকার উচ্চবাচ্য করিবার অধিকারী নয়। আর বিজয়া তাহার আপন অধিকার লইয়াই স্বীয় ধর্ম্মভাব, শিক্ষা ও অবস্থার সদৃশ উদারতার সহিত নরেন্দ্রনাথের প্রার্থনা মঞ্জুর করিল। কিন্তু বিলাস তাহা সহ্য করিবে কেন? কারণ, প্রথমতঃ, বিজয়াকে সুখী করিবার উল্লাসময় কল্পনা ও ভ্রান্ত চেষ্টার ব্যর্থতা; দ্বিতীয়তঃ, বিজয়া কোন প্রকারে তাহার সামান্যমাত্রও অবাধ্য হইয়া চলে ইহা তাহার পক্ষে সহনাতীত ব্যাপার; তৃতীয়তঃ, বিলাসের ধর্ম্মভাব গভীর না হইলেও উৎকট। কথায় কথায় বিলাস বলিয়া উঠিল, "মেয়েমানুষ জাতটাই এম্‌নি নেমকহারাম।"—৫ম পরিচ্ছেদ। এই কথায় বিলাসের অভদ্রতা, অকৃতজ্ঞতা ও রূঢ়তা চরমভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। কোন প্রকারে বিজয়াকে বশ্যতা স্বীকার করাইতে না পারিয়া বিলাস রাসবিহারীর নিকট বিজয়ার অবাধ্যতা বিষয়ে অনুযোগ করিল। নরেন্দ্র আগন্তুক, বিলাস নরেন্দ্রনাথের প্রতি যে ব্যবহার দেখাইয়াছে তাহার মধ্যে শিক্ষা, ভব্যতা বা ভদ্রতা জ্ঞানের কোন আভাস নাই, আছে কেবলমাত্র সজ্ঞান সাহঙ্কার ঔদ্ধত্যের পূর্ণ পরিচয়।

বিলাস আর-এক পা অগ্রসর হইল

বিজয়া রাসবিহারী ও বিলাসবিহারীর নিকটে নরেন্দ্রকে বাস্তুহীন করিবার বিষয়ে অনিচ্ছা জ্ঞাপন করিয়াছে, তা' সত্ত্বেও বিলাস অন্ততঃ আর একবারও বিজয়াকে কোন কথা জিজ্ঞাসা করিল না; এমন কি, কলিকাতা যাইবার পূর্ব্বে সে একবারও বিজয়ার সহিত দেখা করা আবশ্যক মনে করিল না, যেন বিজয়া কেহই নয়। বিলাস কলিকাতা হইতে ফিরিয়া

বিজয়াকে 'তুমি' বলিয়া সম্বোধন করিল, যেন বিলাসই এই বাড়ীর কর্ত্তা, এই বাড়ীর সব ক্রিয়া-কর্ম্মের হোতা। এই 'তুমি' বলায় সে যে প্রণয়ের পথে এক পা অগ্রসর হইল তাহা নহে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'কৃষ্ণকান্তে'র উইলে রোহিণী মধ্যে মধ্যে হরলালকে 'তুমি' বলায় যে-ভাব প্রকাশ পাইয়াছে এখানে সে-ভাবও নহে, শরৎচন্দ্রের 'গৃহদাহে' সুরেশ অচলাকে 'তুমি' বলায় যে-ভাব প্রকাশ পাইয়াছে এখানে সে-ভাবও নহে। এখানে বিলাসের বিজয়ালাভের নিশ্চিন্ততার সঙ্গে দৃপ্ত অহঙ্কারের একটা বহির্বিকাশ হইল মাত্র। বিলাস ইতঃপূর্ব্বে অভদ্রতার যে নিদর্শন দেখাইয়াছে ইহাতে তাহা অপেক্ষা আর বেশী কিছু অভদ্রতা প্রকাশ না হইলেও বিলাস অনধিকারের দিক্ দিয়া আর-এক পা অগ্রসর হইল।

বিলাস পিতার সহিত যুক্তি করিয়া মনে করিয়া লইয়াছিল, কলিকাতা গিয়া সব ঠিক করিয়া আসিলে, এমন কি, ব্রাহ্মধর্ম্মের নেতাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আসিলে বিজয়া আর কিছুই করিতে পারিবে না। কিন্তু কলিকাতা হইতে ফিরিবার পর যখন বিলাস বিজয়ার মুখ হইতে শুনিল 'এখানে ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা করার কোন সার্থকতা নাই, সে হবে না' তখন বিলাসের মাথা ঘুরিয়া গেল। কথায় কথায় বিলাস বলিয়া ফেলিল, 'আমরা তোমার সংস্রব একেবারে পরিত্যাগ করতে পারি জান?' যেন নিতান্ত অনুগ্রহ করিয়া পিতাপুত্রে বিজয়ার রক্ষণাবেক্ষণে ও তাহার সম্পত্তি চালনায় নিযুক্ত আছেন। ইহাতে তখন বিলাসের সগর্ব্ব অভদ্রতা ও নীচতা আর একবার প্রকাশ পাইল মাত্র।

নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিলাসের ঘৃণা ও হিংসা

জগদীশের মৃত্যুর ঠিক পর হইতে রাসবিহারী ও বিলাসবিহারী নরেন্দ্রকে বাস্তুহীন ও দেশত্যাগী করিবার জন্য যে-ভাবে চেষ্টা করিতেছে দেখা যায়, তাহাতে পাঠকের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, তাহারা যেন

জগদীশের মৃত্যুর জন্যই এতদিন অপেক্ষা করিতেছিল। তবে ইহার পূর্ব্বেই নরেন্দ্রনাথের সহিত বিজয়ার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হওয়ার কথাটা রাসবিহারী বিলাসের জ্ঞানগোচর করিয়াছিলেন কি না বলা যায় না। বিলাস প্রথম হইতেই নরেন্দ্রনাথের নাম শুনিলেই যেন ঘৃণায় ও অবজ্ঞায় সঙ্কুচিত হইয়া উঠে। 'আলাপ? ছি! আপনি আমাকে কি মনে করেন বলুন দেখি? আমি ভাব্‌তেই পারিনে যে জগদীশের ছেলের সঙ্গে আলাপ কর্‌ছি। মাথায় বড় বড় চুল—যেমন লম্বা, তেম্‌নি রোগা। বুকের প্রত্যেক পাঁজরটি বোধ করি দূর থেকে গোনা যায়—এই ত চেহারা। তালপাতার সেপাই। ছোঃ—"—৩য় পরিচ্ছেদ। ইহার পর সমাজ প্রতিষ্ঠার অজুহাতে নরেন্দ্র-নাথের ঘর-বাড়ী হস্তগত করিবার জন্য পিতাপুত্রে মিলিয়া যে ব্যাপার করিয়া তুলিয়াছে তাহা কেবলমাত্র হৃদয়হীন অতি স্বার্থপর ব্যক্তি ব্যতীত কোন ভদ্রলোকই করিতে পারে না। জগদীশের মৃত্যুর পূর্ব্বে না জানিলেও এখন নরেন্দ্রনাথের সহিত বিজয়ার বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হওয়ার কথাটা বিলাস নিশ্চিতই পিতার নিকট হইতে জানিয়াছে। সেইজন্য এখন নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিলাসের ঘৃণা-মিশ্রিত অসহ্য দুর্দ্দম্য হিংসাটাই উত্তরোত্তর বাড়িয়া চলিয়াছে। 'একটা অপদার্থ হামবাগ কোথাকার! ভণ্ড! তখন তাকে চিন্‌তুম্‌ না তাই,'—৯ম পরিচ্ছেদ। যেন চিনিতে পারিলেই সেই দিন বিলাস তাহাকে 'অর্দ্ধচন্দ্র' দিয়া বিদায় করিত বা ইহা অপেক্ষা আরও গুরুতর শাস্তি দিয়া ছাড়িত। বিলাস নরেন্দ্রের প্রতি এত হিংসাভাবাপন্ন যে, নরেন্দ্রের নামও যেন তাহার অসহ্য।

বিলাসের অভদ্রতা

ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠার পরদিন বিজয়ার নীচে নামিয়া আসিতে একটু বিলম্ব হইয়াছিল, তাহাতেই বিলাসের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল, সে বলিয়া উঠিল, "ঘুমটা এ বেলায় না ভাঙ্গ্‌লেই ত চ'ল্‌ত, তোমার ব্যবহারে আমি ক্রমশঃ

ডিস্‌গাস্‌টেড্‌ হ'য়ে উঠ্‌ছি—একথা না জানিয়ে আর পার্‌লাম না।"—১৪শ পরিচ্ছেদ। বিলাস তাহার উগ্র কর্ত্তব্যপরায়ণতার পরিচয় দিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু প্রকাশ পাইল রূঢ় অভদ্রতা।

নরেন্দ্রনাথের উপস্থিতি বা সান্নিধ্য রাসবিহারী বা বিলাসবিহারী কাহারও পক্ষে সন্তোষজনক বা সুখকর ছিল না। নরেন্দ্র যখন বিজয়ার শয্যার উপর গিয়া বসিল তখন রাসবিহারী ও বিলাসবিহারী অন্তরের ক্রোধে জ্বলিয়া যাইতে লাগিল। বিলাস প্রথমেই সোজাসুজি নরেন্দ্রনাথের উপর ক্রোধ প্রকাশ করিতে পারে না। বিজয়ার বাড়ীতে বসিয়া বিজয়ারই সম্মুখে তাহারই একজন অতিথিকে অযথা অপমানিত করা হঠাৎ হইয়া উঠে না। সেইজন্য তাহার রাগটা গিয়া পড়িল নির্দ্দোষ কালিপদ চাকরের উপর। "এই শুয়ারকা বাচ্চা, একঠো কুর্‌সী লাও, হারামজাদা চাকর, বলা নেই, কওয়া নেই, এমন একটা অসভ্য লোককে ঘরে এনে ঢোকালে, যে ভদ্রমহিলার সম্মান রাখ্‌তে পর্য্যন্ত জানে না।"—১৬শ পরিচ্ছেদ। (অথচ এই বিলাসই একদিন বিজয়াকে অপমানিত করিয়া বলিয়াছিল—'এই মেয়েমানুষ জাতটাই এম্‌নি নেমকহারাম'—৫ম পরিচ্ছেদ।) এই অসভ্য লোকটা যে কে তাহা কাহারও বুঝিতে বাকী নাই। তবে রাগের এই বহির্বিকাশটা নরেন্দ্রনাথের উপর ঠিক সোজাভাবে না পড়িয়া একটু ঘুরিয়া গিয়া পড়িল। রাসবিহারী আপনার স্বাভাবিক কৌশলে পুত্রের এই জঘন্য ব্যবহারটা সমর্থন করিলেন। 'এক্ষেত্রে তোমার রাগ হওয়াটা যে অস্বাভাবিক নয়, বরঞ্চ স্বাভাবিক, তাও মানি।' বিলাস একটু বল (support) পাইয়া এইবার বলিতে আরও খানিকটা সাহস পাইল যে 'আমার এ বাড়ীর চাকরগুলো হ'য়েছে যেমন হতভাগা, তেম্‌নি বজ্জাত।" এ বাড়ী বিলাসের মোটেই নয়। সে জানে যে, বিজয়ার সহিত তাহার বিবাহ হইবেই, কাজেই শুধু বাড়ী কেন, সম্পত্তিও তাহার। নরেন্দ্রনাথের প্রতি রাসবিহারী ও বিলাস এতখানি বিরূপ যে, নরেন্দ্রনাথ

একেবারে দেশত্যাগী বা আরও কিছু হইলে যেন তাহাদের মঙ্গল হইত, তাহাদের হাড় জুড়াইত, তাহারা স্বস্তিবোধ করিত, কারণ বিলাসের বিজয়া-লাভের প্রধান ও একমাত্র পরিপন্থী নরেন্দ্র। কোন কথায় নরেন্দ্রনাথের জবাব দিবার অধিকার থাকিলেও বিলাসের পক্ষে তাহা কাঁটার মত অসহ্য। তাই বিলাস আর একবার অভদ্রতার চূড়ান্ত করিয়া বলিল, "তুমি কার সঙ্গে কথা কইচ, মনে ক'রে কথা ক'ও ব'লে দিচ্ছি, এ-ঘর না হ'য়ে আর অন্য কোথাও হ'লে তোমার বিদ্রূপ করা",—বিলাসের রাগ এতখানি বাড়িয়াছে যে, আগন্তুক ভদ্রলোককে 'আপনি' বলিবার মত জ্ঞানও তাহার নাই। তাহার মনের ভাব এই যে, অন্য কোথাও হইলে সে হয়ত নরেন্দ্রনাথের প্রাণসংহার করিয়া ছাড়িত, নেহাৎপক্ষে তাহাকে জুতোপেটা করিয়া ছাড়িত।

বিজয়ার সহিত বিলাসের দ্বন্দ্ব

হিংসুক বিলাস নরেন্দ্রনাথের সূত্র ধরিয়া বড় বাড়াবাড়ি আরম্ভ করিল। সে বিজয়ার বাপের আমলের চাকর কালিপদকে এ-বাড়ী হইতে বিদায় করিল। আর একদিন বিজয়ার সাম্‌নেই 'ডাক্তার ত নরেন ডাক্তার,' 'কলির ধন্বন্তরি', 'কোথায় পেলেন সেটাকে' ইত্যাদি মন্তব্য করিয়া সে পুনরায় নরেন্দ্রের প্রতি বিদ্রূপ ও ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া লইল। বিলাস ত আপনার সুযোগ-সুবিধা মতই যখন পারিতেছিল এক একবার বিজয়ার শ্রদ্ধার পাত্র নরেন্দ্রনাথকে বিদ্রূপ, ঘৃণা ও অপমান করিয়া আসিতেছিল। তার উপর আবার বিজয়ার আর এক শ্রদ্ধার পাত্র দয়ালের উপর তাহার অযথা অন্যায় চোট পড়িল। প্রত্যুত্তরে বিলাস কুৎসিত কটুকণ্ঠে দয়ালের জড়িমার নকল করিয়া হাত নাড়িয়া বলিল, "আস্‌তেই পারিনি, তবে আর কি, আমাকে রাজা ক'রেছেন।" "অমন সবাই বিপদের দোহাই পাড়ে। কিন্তু সে শুন্‌তে গেলে ত আমার চলে না। আমি দরকারী কাজ সেরে রাখ্‌তে হুকুম দিয়েছিলাম, হয়নি কেন, সেই কৈফিয়ৎ চাই!

বিপদের খবর জান্‌তে চাইনে।"—১৮শ পরিচ্ছেদ। বিজয়া আজ আর রোগশয্যায় শায়িতা নয়, সে খানিকটা বল পাইয়াছে, তাই সে আর বিলাসকে ছাড়িয়া কথা কহিল না, সে বিলাসকে কাজ না করার দরুণ, বিনা কারণে কামাই করার দরুণ মনিবের ন্যায় কৈফিয়ৎ চাহিয়া বসিল। কথায় কথায় তাহার রাগ বাড়িয়া যাইতেই সে বলিয়া উঠিল, "কাজ কর্‌বার জন্য যাকে মাইনে দিতে হয় তাকে ও-ছাড়া (অর্থাৎ চাকর ছাড়া) আর কি বলে? আপনার অসংখ্য উৎপাত আমি নিঃশব্দে স'য়ে এসেছি, কিন্তু যত সহ্য ক'রেছি, অন্যায় উপদ্রব ততই বেড়ে গেছে। যান নীচে যান (বিলাসের যেন আর উপরে আসিবারও অধিকার নাই), প্রভুভৃত্যের সম্বন্ধ ছাড়া আজ থেকে আপনার সঙ্গে আমার কোন সম্বন্ধ থাক্‌বে না। যে নিয়মে আমার অপর কর্ম্মচারীরা কাজ করে ঠিক সেই নিয়মে কাজ কর্‌তে পারেন কর্‌বেন, নইলে আপনাকে আমি জবাব দিলুম। আমার কাছারীতে আর ঢোক্‌বার চেষ্টা কর্‌বেন না।" "আমার ষ্টেটেই চাক্‌রী কর্‌বেন, আর আমারই উপর অত্যাচার কর্‌বেন। আমাকে 'তুমি' বল্‌বার অধিকার কে আপনাকে দিয়েছে? আমার চাকরকে আমার বাড়ীতে জবাব দেবার, আমার অতিথিকে আমার চোখের সাম্‌নে অপমান কর্‌বার এ সকল স্পর্দ্ধা আপনার কোথা থেকে জন্মাল?"—১৮শ পরিচ্ছেদ। ইহাতে বিলাসের চরম শিক্ষা হওয়া উচিত এবং সকলে ইহাই আশা করে যে, বিলাস এইবার ঠিক জব্দ হইয়া যাইবে, কিন্তু বিলাস এত নির্ল্লজ্জ ও বেহায়া যে, ইহার উপরও সে উত্তর দিতে গেল, অথচ তাহার উত্তর দিবার কিছুই নাই, সব শেষ হইয়া গিয়াছে। তাই সে নরেন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া তাহারই উপর গায়ের ঝাল ঝাড়িবার জন্য বলিল,—"অতিথির বাপের পুণ্য যে সে-দিন তার গায়ে হাত দিইনি—তার একটা হাত ভেঙ্গে দিইনি, নচ্ছার, বদমাইস, জোচ্চোর, লোফার কোথাকার।"—১৮শ পরিচ্ছেদ। ইহাতে বিলাসের নির্ল্লজ্জতা ও নীচ অভদ্রতা আর একবার প্রকাশ হইল মাত্র।

রাসবিহারী

প্রথম পরিচ্ছেদের পর একেবারে পঞ্চম পরিচ্ছেদে আসিয়া আমাদের সহিত রাসবিহারীর দেখা। বিজয়া নরেন্দ্রনাথের মামার দুর্গাপূজার ব্যাপারে তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে হুকুম দিয়াছে—একথা রাসবিহারী আপনার পক্ষে অপমান বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াও যেন বিজয়ার হিতার্থেই আর সে অপমানটা গায়ে মাখিলেন না। কিন্তু বিজয়া নরেন্দ্রকে চিনিতে পারিয়াছে এই আশঙ্কাটাই তাঁহার মনে জাগিয়া উঠিল। রাসবিহারী জানিতেন, তিনি, বনমালী ও জগদীশ যে তিন বন্ধু ছিলেন তাহা বিজয়ার অগোচর ছিল না। নরেন্দ্র রাসবিহারীর বন্ধুপুত্র। কাজেই তিনি নরেন্দ্রকে গৃহহীন করিবেন—ব্যাপারটা অসৌজন্যের পরিচায়ক হইবে এবং বিজয়ার চক্ষে বিসদৃশ ঠেকিবে—ইহা রাসবিহারী জানিতেন। সেইজন্য প্রসঙ্গের প্রথম অবস্থায় যখন রাসবিহারীকে উদ্দেশ করিয়া বিজয়া কহিল, "বাবা মৃত্যুর পূর্ব্বে আমাকে আদেশ ক'রে গিয়েছিলেন, ঋণের দায়ে তাঁর বাল্যবন্ধুর বাড়ী-ঘর যেন বিক্রী ক'রে না নিই। জগদীশ-বাবুর পুত্রকে ডাকিয়ে পাঠিয়ে সমস্ত কথা জানান হয় এই আমার ইচ্ছে। আপনি একবার তাঁকে ডেকে পাঠিয়ে এ বিষয়ে তাঁর কি ইচ্ছা জান্‌তে পার্‌বেন না কি ?" তখন ধূর্ত্ত রাসবিহারী আপনাকে একটু বাঁচাইবার জন্য বিষয়রক্ষার অজুহাত দেখাইয়া ও বিলাসের সহিত বিজয়ার বিবাহের ইঙ্গিত করিয়া বলিলেন, "কিসে তোমাদের ভালো, সে আজ না হয় কাল তোমরাই স্থির ক'রে নিতে পার্‌বে। এ বুড়োর মতামতের আবশ্যক হবে না—কিন্তু একথা যদি বল্‌তে হয়, মা, বল্‌তেই হবে—এ ক্ষেত্রে তোমারই ভুল হচ্ছে। জমিদারী চালাবার কাজে আমাকেও বিলাসের কাছে হার মান্‌তে হয়—সে আমি অনেকবার দেখেছি।" অথচ একটু

পূর্ব্বে রাসবিহারী বলিয়াছেন—বিষয় যখন তোমার, তখন একথা নিয়ে আর অধিক ঘাঁটাঘাঁটি করতে চাইনে। ইহা রাসবিহারীর চালবাজি ও ধূর্ত্তামির প্রথম সোপান।

বিজয়া যে নরেন্দ্রকে গৃহশূন্য করিতে চায় না একথা রাসবিহারী বুঝিলেন। বনমালী মৃত্যুর পূর্ব্বে বিজয়াকে জগদীশের বাড়ীর সম্বন্ধে যে আদেশ দিয়া গিয়াছেন তাহা রাসবিহারী বিজয়ার মুখ হইতে শুনিয়াছেন। বনমালী রাসবিহারীকে সমস্ত সম্পত্তির ভার দিয়াছিলেন। তিনি নরেন্দ্রকে জামাতা করিবার অভিপ্রায়ে নিজের খরচে বিলাত পাঠাইয়া লেখাপড়া শিখাইয়াছিলেন একথা রাসবিহারীর অগোচর থাকিতে পারে না। কাজেই নরেন্দ্রনাথের বাড়ী-ঘরের সম্পর্কে তাহার সহিত বিজয়ার বিবাহ-ব্যাপারটাও বনমালী মৃত্যুর পূর্ব্বে বিজয়াকে জানাইয়া গিয়াছেন একথা রাসবিহারীর মনে ধূমায়িত হইতে বাকী রহিল না। একদিন অজ্ঞাতসারে অপরিচিত নরেন্দ্রনাথের প্রতি বিজয়ার সহানুভূতি প্রকাশ পাইয়াছে, তাহা রাসবিহারীর পক্ষে চিন্তা করিবার বিষয়। তারপর কোন না কোন সূত্রে নরেন্দ্রের সহিত তাহার ভাব হইয়া যায়—রাসবিহারীর এ আশঙ্কাও ছিল। এখন নরেন্দ্রকে গৃহহীন করিতে পারিলে সে এ-দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে এবং নরেন্দ্রের বাড়ীতে সমাজ প্রতিষ্ঠা করিতে পারিলে নরেন্দ্র ভবিষ্যতে দেনাশোধ করিয়া বাড়ীখানি ফিরিয়া পাইবার কোন আশা রাখিবে না। আর সেই সঙ্গে বিজয়ারও নরেন্দ্রকে বাড়ী প্রত্যর্পণ করা বা তাহার সহিত দেখা হওয়ারও কোন সূত্র থাকিবে না। কাজেই বিলাসের সহিত বিজয়ার বিবাহ দিতে ও সেই সঙ্গে বিজয়ার বিশাল সম্পত্তি হস্তগত করিতে রাসবিহারীকে অপেক্ষাকৃত কম বেগ পাইতে হইবে। এই ভাবিয়া রাসবিহারী নরেন্দ্রকে গৃহ ছাড়িয়া দেওয়ার জন্য নোটিশ দিয়া বসিলেন, ভাবিলেন, নরেন্দ্র বাড়ী ছাড়িয়া চলিয়া যাইবে, কাজেই আপাততঃ কণ্টক পরিষ্কার!

নোটিশ দিবার পরেও যখন বিজয়া নরেন্দ্রনাথের বাড়ী ছাড়িয়া দেওয়ার বিষয়ে রাসবিহারীর কথায় আপত্তি করিল, তখন ব্রহ্মজ্ঞানী রাসবিহারী টন্‌টনে ব্রহ্মজ্ঞানের পরিচয় দিতে লাগিলেন ; আপত্তি করিলেন, নরেনের বাড়ী না হইলে সমাজ-প্রতিষ্ঠা হইবে কি করিয়া ? যেন সমাজ-প্রতিষ্ঠার আর কোন উপায় নাই। বিজয়া বলিল, তার জন্য অন্য ব্যবস্থাও আমরা ক'র্‌তে পার্‌ব। ব্রহ্মজ্ঞানীর মনে যে আশঙ্কাটা এতদিন গোপন ছিল এখন তাহা ভাষায় প্রকাশ পাইল, 'যাকে আজ পর্য্যন্ত কখনও চোখেও দেখনি, আমাদের সকলের অনুরোধ এড়িয়ে তার জন্যেই বা তোমার এত ব্যথা কেন ?"—৭ম পরিচ্ছেদ।

রাসবিহারীর কথার উত্তরে বিজয়া বলিল, 'এটা বাবার শেষ অনুরোধ। তা'ছাড়া তিনি (নরেন্দ্রনাথ) একঘরে, গৃহহীন ক'র্‌লে আত্মীয়-কুটুম্ব কারও বাড়ীতেই তাঁর আশ্রয় পাবার পথ নেই তা'ছাড়া গৃহহীন কথাটা মনে ক'র্‌লেই আমার ভারী কষ্ট হয়, কাকাবাবু'—৭ম পরিচ্ছেদ।

এখানে রাসবিহারীর তরফ হইতে উত্তর দিবার মত আর কিছু ছিল না। তবুও উত্তর দিতে হইবে, নতুবা উদ্দেশ্য সিদ্ধির কণ্টক দূর হয় না। এইবার রাসবিহারীর পাকা মস্তিষ্ক হইতে যে উত্তর বাহির হইল তাহা অত্যন্ত হাস্যকর। "তোমার এইটুকু বয়সে যদি এই কষ্ট হয়, আমার এতখানি বয়সে সে কষ্ট কত বড় হ'তে পারে, একটু ভেবে দেখ দেখি?"—৭ম পরিচ্ছেদ। গুরু-মহাশয় পাঠশালার একটি ছেলেকে প্রশ্ন করিলেন, এক বছরের ছেলের দুটি দাঁত, পঁচিশ বৎসরের ছেলের কয়টি দাঁত ? ছেলে সবে কিছুদিন হইল নামতা শিখিয়াছে, কাজেই সে বলিয়া ফেলিল, আজ্ঞে, পঞ্চাশটি দাঁত। এই প্রকার উত্তর যেমন হাস্যকর, রাসবিহারীর উক্তিও ততোধিক হাস্যকর। রাসবিহারী এইবার পরিষ্কার বলিয়া ফেলিলেন, কর্ত্তব্য (স্বার্থ ?) চিরদিনই আমার কাছে কর্ত্তব্য (স্বার্থ) ! তার কাছে হৃদয়-বৃত্তির কোন দাবী-দাওয়া নেই।' এ কথার কোন অর্থই হয় না।

নরেন্দ্রকে দেশত্যাগী করিবার জন্য স্বার্থান্ধ পিশাচের কি রকম কুটিল প্রয়াস!

নবম পরিচ্ছেদে রাসবিহারী ছেলেকে বলিতেছেন, 'মানুষ যেমন অপরাধীই হউক, ভগবান তাকে যত দণ্ডই দিন, (যেন নিজে কিছুই অনিষ্ট করিতেছেন না) তার দুঃখে আমাদের দুঃখিত হওয়া উচিত, সমবেদনা প্রকাশ করা উচিত। আমি বল্‌চিনে তুমি অন্তরে কষ্ট পাচ্ছ না, কিন্তু বাইরেও সেটা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য।' ইহাতে রাসবিহারীর শয়তানির আর এক রূপ প্রকাশ পাইয়াছে। একজন অপরের যতই অনিষ্ট করুক না কেন, অনিষ্টকারী একবার মুখে আজকালকার রীতি (fashion) অনুযায়ী sorry, excuse me বলিলেই যেন ক্ষতি-কারকের পক্ষ হইতে দোষ স্খালন হইয়া যায়।

রাসবিহারীর শয়তানির আর এক রূপ দেখিতে পাওয়া যায়, প্রীতি-ভোজের আসরে। রাসবিহারী বলিলেন,—আমি সমস্ত নির্য্যাতন সহ্য ক'রে গ্রামে থাক্‌তেই প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হ'লাম'—১৩শ পরিচ্ছেদ। আসলে ব্যাপারটা ঠিক তাহা নহে। তিনি টাকার অভাবে দেশ ছাড়িতে না পারিয়া থাকিতে বাধ্য হইলেন। বিজয়ার সম্মুখে বনমালীর সম্বন্ধে রাসবিহারীর উক্তি বা ধর্ম্মপ্রসঙ্গের আর অন্য কোন মানে নাই—কেবলমাত্র কৌশলে সকলের সম্মুখে বিলাসের সহিত বিবাহে বিজয়ার সম্মতিটা জোর করিয়া টানিয়া বাহির করা—নিতান্ত না পারিলেও তাহার মৌন সম্মতিটা সকলকে জানাইয়া দেওয়া। রাসবিহারী বলিলেন, 'সে (বনমালী) যে এত শীঘ্র চ'লে যেতে পারে, সে খেয়াল ত ক'র্‌লাম না।' যেন বনমালীর মৃত্যুর কথা ভাবিলে বা জানিলে তিনি বিলাসের সহিত বিজয়ার বিবাহ দিয়া দিতে পারিতেন, কিন্তু বনমালী বাঁচিয়া থাকিতে বিলাসের সহিত বিজয়ার বিবাহ দেওয়া যে একেবারে অসাধ্য ছিল তাহাও তিনি মনে মনে জানিতেন। তাহা হইলেও বনমালীর যে এ বিবাহে পূর্ণ সম্মতি ছিল, তাহা

বিজয়াকে জোর করিয়া জানাইতেই হইবে, নতুবা বিজয়ার ধারণার পরিবর্ত্তন হওয়ার কিছুমাত্র আশা থাকে না। রাসবিহারী বলিলেন, "নিজের শরীরের দিকে চেয়ে এই আগামী ফাল্গুনের বেশী আর আমার বিলম্ব ক'র্‌বার সাহস হয় না।"—১৩শ পরিচ্ছেদ। নিজের শরীরের দিকে চাহিয়া না হউক, বিজয়ার মানসিক অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই তাঁহাকে যত শীঘ্র সম্ভব এই বিবাহের আয়োজনে মনোযোগ দিতে হইতেছে, পাছে বিজয়া ও সেই সঙ্গে তাহার বিশাল সম্পত্তি হাত-ছাড়া হইয়া যায়। আর ঘন ঘন বনমালীর নাম করার অর্থ এই যে, পিতার নামে বিজয়ার হৃদয় আপনা হইতেই বিগলিত হইয়া যাইবে এবং বিবাহে সে সহজেই সম্মতি দান করিবে। আর বিশেষভাবে এতগুলি সমাগত ভদ্রলোকের সম্মুখে বিজয়া মৌন সম্মতি না দিয়াই বা পারিবে কেন? তাই রাসবিহারী কৌশলে বলিয়া বসিলেন"—লজ্জা ক'রো না, মা, বল, আজ এইখানেই আমাদের এই পূজনীয় অতিথিগণকে আগামী ফাল্গুন মাসেই আবার একবার পদধূলি দেবার জন্য আমন্ত্রণ ক'রে রাখি।"—১৩শ পরিচ্ছেদ। এই সময় বিজয়ার মনের অবস্থা যাহাই হউক না কেন, সে কথা বলিতে পারিল না। কাজেই রাসবিহারী ধরিয়া লইলেন—মৌনং সম্মতিলক্ষণম্—মা আমার লজ্জায় কথা ব'ল্‌তে পার্‌ছেন না। বিবাহের প্রস্তাবে বিজয়ার আন্তরিক সম্মতি দেওয়া ত দূরের কথা—বরং সে বিরক্ত ও ক্ষুব্ধ হইয়াছে। কিন্তু রাসবিহারী বিজয়ার মৌনভাবটাকে জোরপূর্ব্বক সলজ্জ নম্র সম্মতি বলিয়া ধরিয়া থাকিয়া তাহাকে আরও একটু খুসী করিবার ভ্রান্ত আশায় একান্তে নরেন্দ্রনাথের প্রসঙ্গটা উত্থাপন করিলেন। 'তোমাকে সে কথাটা ব'ল্‌তে একেবারেই ভুলে গিয়েছিলাম, মা, সেই মাইক্রস্কোপের দামটা আমি তাঁকে দিয়ে দিয়েছি'—১৩শ পরিচ্ছেদ।

বিজয়া ও বিলাসের মধ্যে দ্বন্দ্বের ব্যাপারে রাসবিহারী বুঝিয়াছেন, বিলাসেরই দোষ সবটা; তা'ছাড়া সম্পত্তি বিজয়ার, তাঁহারা পিতাপুত্রে

কেবল একটা প্রকাণ্ড স্বার্থসিদ্ধির আশায় এমন মন-প্রাণ দিয়া তাহার সম্পত্তি দেখাশুনা করিতেছেন। বিজয়া বিলাসকে রূঢ় বাক্যে অপমানিত করিয়া কিছুমাত্র অন্যায় করে নাই—ইহা সমস্তই রাসবিহারী বুঝিয়াছেন। এখন যদি বিলাসের পক্ষ হইয়া বিজয়ার নিকটে কিছু বলিতে যাওয়া যায় তাহা হইলে যে সামান্য সূত্রটুকু লাগিয়া আছে তাহাও ছিন্ন হইয়া যাইবে। কাজেই এই সঙ্কট-মুহূর্ত্তে বিজয়াকে আরও খানিকটা বড় করিয়া দেওয়া দরকার। বিজয়াকে সমর্থন না করিলে এবং বিলাসকে দোষান্বিত না করিলে সব বেফাঁস হইয়া যায়। কাজেই সুচতুর রাসবিহারী আপনার সমস্ত ভাবটুকু গোপন করিয়া বিজয়ার কাজের সমর্থন করিলেন এবং বিলাসকে আরও খানিকটা শাস্তিভোগ করিতে দিবার জন্য বিজয়াকে বার বার অনুরোধ করিলেন। যে রাসবিহারী একদিন আপনার স্বার্থ-সিদ্ধির কণ্টক পরিষ্কার করিতে নরেন্দ্রনাথকে বাস্তুশূন্য করিবার জন্য কর্ত্তব্যের দোহাই পাড়িয়া বলিয়াছিলেন, "কর্ত্তব্য চিরদিনই আমার কাছে কর্ত্তব্য, তার কাছে হৃদয়-বৃত্তির কোন দাবী-দাওয়া নেই"—(৭ম পরিচ্ছেদ), সেই রাসবিহারী আজ স্বার্থসিদ্ধির জন্য আবার বিপরীত সুর ধরিলেন, "কাজ, কাজ, সংসারে শুধু কাজ ক'র্‌তেই কি এসেছি! কাজের পায়ে কি দয়ামায়াও বিসর্জ্জন দিতে হবে!"—১৯শ পরিচ্ছেদ। রাসবিহারীর মত এমন সূক্ষ্ম-বিচার-বুদ্ধির লোক সংসারে সত্যই বিরল, তিনি আদৌ "খোলা-ভোলা উদাসীন লোক" নন্, একেবারে অটুট-স্বার্থ-জ্ঞান-বিশিষ্ট শয়তান।

রাসবিহারীর বিষয়-বুদ্ধি

রাসবিহারীর মত পাকা বিষয়ী লোকের বিজয়ার উপর স্নেহ বর্ষণ করিবার ও এত লক্ষ্য রাখিবার একমাত্র কারণ তাহার মস্ত বড় জমিদারী ও ঘর-বাড়ী হস্তগত করা। বিলাসের সহিত বিজয়ার বিবাহ দিতে পারিলেই কাজটা অনেকটা সহজেই হাঁসিল হইয়া যায়। সেইজন্য তিনি

সহরের আবহাওয়া হইতে বিজয়াকে গাঁয়ে টানিয়া আনিয়াছেন। ব্রাহ্ম-মন্দির-প্রতিষ্ঠা-ব্যাপারের মধ্যে তাহার ও বিলাসের উৎকট ধর্ম্মপিপাসা দেখাইতে কিছুদিন কাটিয়া গেল। নরেনের প্রতি বিজয়ার আসক্তির কথা রাসবিহারীর অগোচর ছিল না। সেইজন্য তিনি বিবাহ-ব্যাপারটা একটু তাড়াতাড়ি সারিয়া ফেলিতেই চেষ্টা করিতেছিলেন। কিন্তু বনমালীর মৃত্যুর পর এক বৎসর অতীত হয় নাই বলিয়া রাসবিহারীকে বাধ্য হইয়া একটু অপেক্ষা করিতে হইল। তিনি যেন মনে মনে দিন গুণিতেছিলেন—শুভ বৈশাখ মাসটা কবে আসিবে? বৈশাখের প্রথম দিন আসিল। ঐ দিন কৌশলে একটা উপাসনা-আসরের আয়োজন করিয়া রাসবিহারী সকলকে, বিশেষভাবে নরেনের কর্ণমূলে, বিলাসের সহিত বিজয়ার বিবাহ-সম্বন্ধটা আর একবার জানাইয়া দিলেন এবং এই উৎসবটা দিন কয়েক স্মরণে রাখিবার জন্য আশীর্ব্বাদ-স্বরূপ একজোড়া 'অত্যাচারের হাতকড়ি' বিজয়ার হাতে পরাইয়া দিয়া ছাড়িলেন, আর বৈশাখের এই কয়টা দিন কি করিয়া কাটে তাহার জন্য ভাবনায় অপেক্ষা করিতে লাগিলেন।

এই বৈশাখের প্রথম দিনেই আবার বিজয়া নরেন্দ্রকে মাঠের মধ্য হইতে ডাকিয়া আনিয়া খাওয়াইল। চরের বন্দোবস্ত আছে, কথা রাসবিহারীর অগোচর রহিল না। 'না আঁচালে বিশ্বাস নাই'—যতক্ষণ না বিবাহ কাজটা শেষ হইয়া যায়, ততক্ষণ রাসবিহারীর আর ভাবনার অন্ত নাই, চোখে ঘুম নাই। সেইজন্য তিনি ভাবিয়া চিন্তিয়া আপাততঃ মোকর্দ্দমার অজুহাতে মূল দলিলগুলি হস্তগত করিতে চলিলেন। দলিলের ব্যাপার লইয়া বিজয়ার সহিত রাসবিহারীর ঝগড়া হইয়া গেল। কথায় কথায় রাসবিহারী বলিলেন, "একটা অজানা অচেনা হতভাগাকে মাঠের মধ্যে থেকে ধ'রে এনে যে কাল সমস্ত বেলাটা কাটালে তার মানে কি আমি বুঝ্‌তে পারি নে?"—২৩শ পরিচ্ছেদ। এই অজানা অচেনা হতভাগা যে নরেন্দ্রনাথ সে কথা বলাই বাহুল্য। রাসবিহারীর কাছে নরেন অজানা

অচেনা হতভাগা—নরেন হয়ত হতভাগা—কারণ তাহার মা নাই, বাপ নাই, আত্মীয়-স্বজন নাই, বন্ধু-বান্ধব নাই। তার সমস্ত সম্পত্তি, এমন কি, বাস্তুভিটা পর্য্যন্ত দেনার দায়ে নীলাম হইয়া গেল। কাজেই সে হতভাগা বই কি! কিন্তু এই রাসবিহারী একদিন, নরেন মাসে চারি শত টাকা মাহিনা পায় শুনিয়া, মুখ বিবর্ণ করিয়া ফেলিয়াছিল অর্থাৎ নরেন ছোঁড়া মাসে এত টাকা রোজগার করে—এই রকম ভাবটা। নরেন রাসবিহারীর কাছে আদৌ অজানা অচেনা নয়। রাসবিহারী একদিন নরেনকে বলিয়াছিলেন—'পাঁচজনের সাম্‌নে তোমাকে বাবু-ই বলি আর যা'ই বলি বাবা, এটা কিন্তু ভুল্‌তে পারিনে যে, তুমি আমাদের সেই জগদীশের ছেলে।'—১৬শ পরিচ্ছেদ। এই মাত্র কালই তিনি তাহাকে উপাসনা-আসরে আসিবার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়াছেন এবং নরেন আসিলে তাহাকে 'এসো, বাবা, এসো' বলিয়া খাতির করিয়াছেন। রাসবিহারী তারপরে বলিয়াছেন—'আমার এ-ও ছেলে, ও-ও ছেলে।' আজ তিনি নরেনকে বলিলেন অজানা, অচেনা!

বিজয়ার সহিত কোনদিন যেন ঝগড়া হয় নাই—বা মনোমালিন্য পর্য্যন্ত হয় নাই—এই রকম একটা কপট ভাব লইয়া রাসবিহারী বিবাহের দলিলে বিজয়ার সই করাইয়া লইবার জন্য বিজয়ার নিকটে উপস্থিত হইলেন এবং দলিলখানি তাহার সাম্‌নে মেলিয়া ধরিলেন। বিজয়া রাসবিহারীর আরোপিত পাপের উল্লেখ করিলে রাসবিহারী উচ্চকণ্ঠে "কখ্‌খনো না! কখ্‌খনো না! এ যে অসম্ভব! এ যে ঘোর মিথ্যে—অতি বড় শত্রুও ত তোমাকে ও-অপবাদ দিতে পারে না মা!" ইত্যাদি বলিয়া আপনার স্বাভাবিক কৌশলে বিজয়ার স্বাক্ষর আদায় করিয়া লইলেন।

বিবাহ-শেষে রাসবিহারীর সহিত আমাদের শেষ দেখা। রাসবিহারী নলিনীর প্রতি আর একবার অগ্নিদৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেলেন।

শেষ কথা

হৃদয়ের মিলনই প্রকৃত মিলন। ইহা শুধু গ্রন্থকারের উক্তি বা মত নহে। ইহা চিরন্তন সত্য। শরৎচন্দ্রের পূর্ব্বে বহু লোক একথা বলিয়া গিয়াছেন। এই সত্যের ব্যভিচারের বিষময় ফল এড়াইবার জন্য সামাজিক বিবাহ-প্রথার আবশ্যকতা আছে। এখানে ইহাও বলিয়া রাখা দরকার মনে করি যে, সামাজিক বিবাহ-প্রথা কেবলমাত্র ঐ বিষময় ফল এড়াইবার জন্য নহে, ইহার আরও অনেক মঙ্গলময় উদ্দেশ্য আছে। তবে ইহাও ঠিক, এই বর্ত্তমান-প্রচলিত সামাজিক বিবাহ-প্রথার যুক্তিহীন অন্ধ পালন অনেক ক্ষেত্রে আবার বিষময় ফল উৎপাদন করে। যাহাই হউক, গ্রন্থকার আখ্যায়িকার 'দত্তা' নাম সার্থক করিয়া তুলিয়াছেন।

'দত্তা' আখ্যায়িকার নায়িকা বিজয়া। আখ্যায়িকার নামের সার্থকতা সম্পাদনের জন্য বিজয়া অবিবাহিতা, কিন্তু দত্তা। আর ব্রাহ্মসমাজে (এবং আজকাল হিন্দুসমাজেও) একটু বেশী বয়সে বিবাহ হয় বলিয়াই সে যুবতী। এই যুবতীর বিবাহ-ব্যাপার (ঠিক প্রণয় নয়) লইয়াই আখ্যায়িকার ঘটনা। বিজয়ার পিতার আদেশটাই যেন অলক্ষ্যে থাকিয়া ঘটনাকে ঠেলিয়া লইয়া যাইতেছিল। গ্রন্থের প্রথমাংশে বিলাসকেই নায়ক হিসাবে চোখে পড়ে। নরেন্দ্র তখনও বিজয়ার সহিত ঠিক পরিচিত হয় নাই। পরে নরেন্দ্র হইয়া দাঁড়াইল প্রতিনায়ক—এটা অবশ্য বিবাহ-ব্যাপারে; প্রণয় ব্যাপারে সে-ই নায়ক। শেষে নরেন্দ্রই সর্ব্বাংশে নায়ক হইয়া দাঁড়াইল এবং বিলাস থাকিয়া গেল প্রতিনায়ক। নরেনের সহিত বিজয়ার প্রণয় একটু বেশ রহস্যময়। প্রথম অবস্থায় বিলাসের নায়ক হওয়াই স্বাভাবিক, কারণ বিলাস শিক্ষিত, সুদর্শন, সমসম্প্রদায়ভুক্ত, আর সে বিজয়ার বাল্যকাল হইতে তাহার সহিত মেলামেশা করিয়া আসিতেছিল। তাহার সাহচর্য্যে

প্রণয় সঞ্চার হওয়া স্বাভাবিক এবং হইয়াছিলও তাহাই। কাজেই বিলাসকেই প্রথমে নায়কের আসনে চোখে পড়ে। আর নরেনের তখন দেখা নাই, প্রতিনায়ক হওয়া ত দূরের কথা। বিজয়া পরে পিতার নিকট হইতে নরেনের কথা শুনিল। শুনিয়াও যে প্রণয়-সঞ্চার হয় না এমন নহে, কিন্তু বিজয়া পিতার নিকটে শুনিয়াছিল, নরেনের বাড়ী-ঘর সমস্তই দেনার দায়ে তাহাদেরই কাছে বাঁধা আছে। বিলাসের মুখে সে নরেনের রূপের কথা শুনিয়াছিল। "যেমন লম্বা, তেমনি রোগা, বুকের প্রত্যেক পাঁজরটি বোধ করি দূর থেকে গোণা যায়—এই ত চেহারা। তালপাতার সেপাই!"—৩য় পরিচ্ছেদ। ইহাতে আর শ্রবণাৎ প্রণয়-সঞ্চার হইবার কি আছে! তারপর দয়া করিতে গিয়াও যে প্রণয়-সঞ্চার হইবে তাহার আপাততঃ উপায় নাই। কারণ শিক্ষিতা বিজয়া বিলাসকে চোখের সাম্‌নে দেখিয়া পিতার অনুরোধেও নরেনকে তার বাড়ী ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক। সেখানে দয়ার কথা নাই। আর পিতৃ-আদেশ পালন করিতে গিয়া যে-টুকু দয়া দেখাইবার দরকার, একজনকে না দেখিয়াই সে সেই দয়া দেখাইতে যাইবে এবং তাহাতেই প্রণয়-সঞ্চার হইবে এমন সম্ভব হয় না। তবে বিজয়া শুনিয়াছিল, নরেন ভগবানকে ভালবাসে। বিজয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিল—'এইটাই কি সব চেয়ে বড় পারা, বাবা ?' বনমালী বিজয়াকে নরেনের হাতে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তারপর মৃত্যুকালে এই কথাটাকে আরও পাকা ও অভ্রান্ত করিবার জন্য আশীর্ব্বাদ করিয়া গেলেন, 'তুমি নিজে পারো আর না পারো, মা, যে পারে তার পায়ে যেন মাথা পাত্‌তে পারো।'
—২য় পরিচ্ছেদ।

বিজয়া গ্রামে গিয়া পিতার আদেশ ভুলে নাই। তাহা পালনের জন্য সে চেষ্টা করিয়াছে। তারপরে সে ছদ্মবেশী নরেনের মুখ হইতে নরেনের কিছু গুণের কথা জানিয়াছে,—'নরেন বিলাত-ফেরৎ ডাক্তার, তিনি নানা যন্ত্রপাতি নিয়ে দিন-রাত খুব পরিশ্রম করেন। সময় পেলে ছবি আঁকেন, তিনি বিনা

বেতনে গ্রামের লোকদিগকে লেখাপড়া ও বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে চাষাবাদ-প্রণালী শেখান ইত্যাদি।'—৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ। আবার ইহারই পূর্ব্বে বিলাস তাহাকে অপমানিত করিয়াছে—'মেয়েমানুষ জাতটাই এমনি নেমকহারাম' —৫ম পরিচ্ছেদ। ইহার উপর বিজয়ার হৃদয় একেবারে পাষাণ-নির্ম্মিত নয়, তাহারও শরীরে দয়ামায়া আছে। সে একজনকে গৃহশূন্য হইতে দেখিয়া ক্লেশানুভব করে। কাজেই পিতার আদেশ ও আশীর্ব্বাদ, বিলাসের নিকট হইতে অপমান, নারী হৃদয়ের স্বাভাবিক কোমল দয়াগুণ ও নরেনের গুণাবলী শ্রবণ—এই কয়টা জিনিষ মিলিত হইয়াই নরেনের প্রতি বিজয়ার প্রণয়-সঞ্চারের কারণ হইয়া উঠিল।

প্রকৃতপক্ষে এইখান হইতে নরেন নায়ক হইয়া উঠিল। প্রতিনায়ক হইল বিলাস। নরেন প্রায় শেষ পর্য্যন্ত কোন দিনই মুখ ফুটিয়া বিজয়ার নিকট প্রণয় জ্ঞাপন করে নাই। বিলাস কিন্তু ভাবে, ভঙ্গীতে, কথাবার্ত্তায়, আচার-ব্যবহারে সব দিক দিয়াই তাহার গর্ব্বদৃপ্ত ভালবাসা বিজয়াকে দেখাইয়া দিয়াছে, কিন্তু তাহা ফলদায়ক হয় নাই; আবার নরেনের উপস্থিতিতে সে হিংসায় মরিয়া যাইতেছে।

বর্ত্তমান আখ্যায়িকার নায়িকা শিক্ষিতা ধনী ব্রাহ্ম-কুমারী, নায়ক দরিদ্র হিন্দু-কুমার, প্রতিনায়ক শিক্ষিত ও সঙ্গতিসম্পন্ন ব্রাহ্ম কুমার। নরেন ও বিজয়ার মধ্যে যে প্রণয় ও বিশেষভাবে বিবাহ, এমন বড় একটা দেখা যায় না। কারণ এক পক্ষ ধনী ও ব্রাহ্ম, আর অপর পক্ষ দরিদ্র ও হিন্দু। এমন ক্ষেত্রে প্রণয় হওয়াটা যে এমন কিছু অস্বাভাবিক তাহা নহে। শিক্ষিত সুদর্শন ব্রাহ্ম কুমার বর্ত্তমান থাকিতে হিন্দু যুবকের সহিত বিবাহ—ইহাতে কাহারও কাহারও হয়ত অসন্তোষ জন্মিতে পারে। কিন্তু বুঝিয়া দেখা উচিত প্রণয়, ভালবাসা এ সব স্বতন্ত্র জিনিষ। আর ব্রাহ্মগণ ত এই কথাটাই বেশী স্বীকার করেন এবং মানেন, যে, হৃদয়ের মিলনই প্রকৃত মিলন, তারপর প্রথানুযায়ী বিবাহ। অবশ্য হিন্দুগণ যে একথা উড়াইয়া

দেন তাহা নহে, তবে তাঁহারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে ও অধিকাংশ সময়ে নিজের স্বার্থ অপেক্ষা পাঁচজনের স্বার্থটাই বেশী দেখেন; সেইজন্ম তাঁহারা সমাজ মানিয়া, সমাজ রক্ষা করিয়া আপনার সুখ-সুবিধা দেখিতে যান, তাহাতে যখন যাহা জুটে এবং যেমন ঘটে। নরেন ও বিজয়ার মধ্যে যখন হৃদয়ের প্রকৃত মিলন হইয়াছে তখন বিবাহটা যে মতে হউক হইলেই বা ক্ষতি কি? ব্রাহ্মসমাজের আসল উদ্দেশ্য ত সফল হইয়াছে। কাজেই এমন মিলন ঘটাইয়া শরৎচন্দ্র কিছু অন্যায় করেন নাই। আর নরেনের দিক হইতে বা হিন্দুসমাজের দিক হইতে এ-বিষয়ে কিছু বলিবার নাই, কারণ বিবাহ হইয়াছে বিশুদ্ধ হিন্দুমতে; আর যে মতেই হউক, বলিবার কিছুই নাই আরও এইজন্য যে, নরেন ত একঘরে, তাহার আত্মীয়-স্বজন তাহার সহিত সামাজিকতা রাখে না বা লোক-লৌকিকতা করে না; কাজেই সে এখন কোন সমাজ-ভুক্ত নহে। তাহার উপর কোন দোষ আসিতে পারে না। আর সাধারণ চক্ষে দেখিতে গেলে আরও ভাল এই জন্য যে, সে বিলাত-ফেরৎ বড় ডাক্তার, ইচ্ছা করিলেই সে ইউরোপীয় মহিলা বিবাহ করিতে পারিত, আর তাহাতে তাহাকে হাতীপোষার হায়রাণ ভোগ করিতে হইত। তার চেয়ে সে একজন শিক্ষিতা ধনী ব্রাহ্ম কুমারীকে বিবাহ করিয়া সব দিক দিয়াই ভাল করিয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম আর ব্রাহ্মধর্ম্ম বিশেষ তফাৎ নহে। তারপর বিবাহ-ব্যাপারে আজকালকার তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায়ের নজর বেশীর ভাগ অর্থের দিকে। যে-পাত্র বিবাহ করিয়া যত বেশী টাকা আনিতে পারে তাহার তত বেশী নাম, বাহাদুরী ও লাভ। নরেন সে-দিক দিয়াও লাভ করিয়াছে। দুঃখ এই, নরেনের মা-বাপ নাই।

বিজয়া নায়িকা, অথচ আখ্যায়িকায় নায়িকার রূপ-বর্ণনার একান্ত অভাব। নায়ক ও প্রতিনায়কের রূপ-বর্ণনার মধ্যে এমন বিশেষ কিছু নাই যাহাতে একজন যুবতীর চোখে নেশা লাগিয়া যাইতে পারে। আর

নায়িকার রূপ-বর্ণনা একেবারে নাই। তবে কিসের মোহে বিলাস ও নরেন্দ্র উভয়ে বিজয়াকে পাইতে চায়। বিলাসের দিক্ হইতে বলা যায়—শিক্ষিতা মহিলার সাহচর্য্যে তাহার প্রণয় জন্মিয়াছিল, তারপর বিজয়ার বিশাল বিষয়ের উপর তাহার একটা দারুণ লোভও ছিল। কিন্তু নরেন সে-প্রকৃতির লোক নয়; তবে এমন অনেক সময় দেখা যায় যে, একজন আর একজনকে কোন প্রকার বিচার না করিয়া, কোন একটা জিনিষকে হেতু না করিয়া অজ্ঞাতসারে পাইতে চায়, তা' সে জানে না। যখন কোন প্রকারে উভয়ের মধ্যে বিচ্ছেদ উপস্থিত হয়, কিছুকালের জন্য ঈপ্সিত ব্যক্তির অদর্শন ঘটে, অথবা আর কেহ আসিয়া তাহার উপর প্রভাব বিস্তার করে তখন সে সহ্য করিতে পারে না, দুঃখ পায়। বিজয়ার প্রতি নরেনের প্রণয় অনেকটা সেই প্রকারের। তবে বিজয়া গৌরবর্ণা, সে শিক্ষিতা অথচ নম্রা, সলজ্জা অথচ তেজস্বিনী। নরেনের নিকট বিজয়ার রূপ ধরা পড়িয়াছিল একদিন—"আপনাকে ত আমি আরও কয়েক বার দেখেছি, কিন্তু আজ আপনি ঘরে ঢুক্‌তেই আমার চোখ খুলে গেল। আমি নিশ্চয়ই বল্‌তে পারি, যে ছবি আঁক্‌তে জানে তারই আপনাকে দেখে আজ লোভ হবে! বাঃ কি সুন্দর!"—১১শ পরিচ্ছেদ।

আর এক কথা এই যে, নরেন ও বিজয়ার প্রণয় অবৈধ নয়, কারণ নরেন অবিবাহিত যুবক, বিজয়া অবিবাহিতা যুবতী, উভয়ের মধ্যে প্রণয় হওয়া স্বাভাবিক এবং প্রণয় হইলেও দোষের কিছুই নাই। তবে বিবাহটা ঠিক inter-caste marriage হইল না। কারণ সমধর্ম্মাবলম্বীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ভুক্ত পাত্রকন্যার বিবাহটা inter-caste marriage বলিয়াই ধরা হয়। এটা যেন ঠিক inter-religion marriage হইল। অথচ ঠিক civil marriage'ও নয়। শরৎচন্দ্র inter-caste marriage বা inter-religion marriage এর পক্ষপাতী কি না তাহা ঠিক বুঝা যায় না, তবে আমাদের দেশের কেহ পাশ্চাত্য দেশে

গিয়া প্রেমে পড়িয়া সেই দেশের ভিন্ন ধর্ম্মের মহিলাকে বিবাহ করিয়া আনিলে যেমন কোন মত প্রকাশ পায় না, প্রকাশ পায় কেবল একনিষ্ঠ প্রণয়, তদ্রূপ নরেন ও বিজয়ার বিবাহ ঘটাইবার ব্যাপার হইতে গ্রন্থকারের কোন স্পষ্ট অভিমত পাওয়া যায় না। তবে তিনি নরেনের মুখ দিয়া একবার যাহা বলাইয়াছেন তাহাতে বুঝা যায় ধর্ম্মমতের পার্থক্য থাকিলেও মিলনে ত আপত্তি নাই এবং তদ্ধেতু বিবাহেও আপত্তি নাই। তবে যে দেশে এবং বিশেষভাবে যে হিন্দুসমাজে inter-caste marriage প্রচলিত হয় নাই বা প্রচলনের চেষ্টা হয় নাই সেখানে একেবারে inter-religion marriage ঘটান যেন একটু বাড়াবাড়ি। আর ইহা আপাততঃ সম্ভব হয় নরেন বা নরেনের মত লোকের ব্যাপারে—যাহাদের সমাজের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই বা যাহারা সমাজের সহিত কোন সম্বন্ধ রাখা দরকার মনে করে নাই। গ্রন্থকার যদি ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মেরই অন্তর্ভুক্ত মনে করেন তবে জটিলতা অনেকাংশে কমিয়া যায়। ব্রাহ্মধর্ম্মকে হিন্দুধর্ম্মের অন্তর্গত বলিলে বোধ হয় কোন কোন ব্রাহ্ম নেতা একটু চঞ্চল হইয়া উঠিবেন।

পরিশিষ্ট

ক—'দত্তা'য় পরেশের স্থান

'দত্তা'য় বিজয়া, রাসবিহারী, বিলাসবিহারী, নরেন্দ্রনাথ প্রভৃতির স্থান যেমন স্বতন্ত্র ও বিশিষ্ট, দাসীপুত্র 'পরেশের' স্থানও তেমনি মনোজ্ঞ ও অনবজ্ঞেয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টির মধ্যে পিপীলিকার যেমন একটা বিশিষ্ট স্থান আছে, সংসার-চালনায় সামান্য একটা ছুঁচের যেমন অপরিহার্য্য আবশ্যকতা আছে, একটা বিরাট কলকারখানার মধ্যে সামান্য একটা কাঁটার যেমন সুস্পষ্ট অস্তিত্ব আছে, তেমনি 'দত্তা' আখ্যায়িকায় পরেশেরও একটা বিশেষ স্থান আছে—যে লক্ষ্য এড়াইয়া যায় না, বরং যে পাঠকের চিত্তে আনন্দ দেয় এবং আখ্যায়িকার সরসতা সম্পাদন করে।

আখ্যায়িকার মধ্যে পরেশকে যে কয়েকবার চোখে পড়ে, তাহার মধ্যে দুইবারের কথা পাঠকের বেশ স্মরণ থাকে এবং মনে হয় যেন পরেশ না থাকিলে আখ্যায়িকাটা একটু রসহীন হইয়া পড়িত এবং 'দত্তা'-চরিত্রের সলজ্জ ঔজ্জ্বল্য অনেকখানি কমিয়া গিয়া শিক্ষিতার তেজস্বিতার তাপ অযথা অনেকখানি বাড়িয়া যাইত। তাহাতে বিজয়াকে এত মধুর, এত উজ্জ্বল, এত দীপ্ত, এত মহিমাময়ী বলিয়া বলিবার পক্ষে অনেকখানি বাধা আসিয়া যাইত।

বনমালীর অভিপ্রায়, আদেশ বা আশীর্ব্বাদের অনির্দ্দেশ্য ফলেই হউক, বা বিলাসের কৃত অপমানের নিমিত্তই হউক, বা নরেনের গুণপনার কথা শ্রবণের জন্যই হউক, অথবা নারীহৃদয়ের স্বাভাবিক কোমলতা ও দয়া-প্রবণতার বশেই হউক, অথবা গভীর বুদ্ধিমত্তার বলেই হউক, নরেনের কথা সবিস্তারে জানিবার জন্য বিজয়ার আগ্রহ জন্মিয়াছিল। অথচ

নরেনের সম্বন্ধে কোন কথা জানিবার বিষয়ে বা তাহাকে এতটুকু অনুগ্রহ দেখাইবার বিষয়ে যে বাধা দাঁড়াইয়াছিল তাহা রাসবিহারীর কুটিল-কৌশল-জাল ও অন্যায় যুক্তি এবং বিলাসবিহারীর হিংসায় ঘেরা উৎকট ধর্ম্ম-পরায়ণতার মুখোস। বিজয়া বুদ্ধিমতী হইলেও প্রথমে সে রাসবিহারী ও বিলাসের কৌশলজাল ভেদ করিতে পারে নাই। অথচ এই রাসবিহারী আবার তাহার অভিভাবক। তারপর সে সবেমাত্র কিছুদিন হইল সহর হইতে গ্রামে আসিয়াছে। এখানে গ্রামের পাঁচ জন আছে, চোখের সাম্‌নে তাহার জমিদারীর কর্ম্মচারী, দরওয়ান প্রভৃতি আছে। সে চট্ করিয়া এমন কিছু করিয়া ফেলিতে পারে না, যাহা একসঙ্গে সকলের আলোচনার বিষয়ীভূত হইতে পারে বা রাসবিহারীর মতের বিরুদ্ধে যাইতে পারে। অথচ নরেনের বিষয় সবিস্তারে জানিবার জন্য তাহার চিত্ত ছট্‌ফট্ করিতেছিল। এই সঙ্কট-সময়ে সরম, সঙ্কোচ ও সম্ভ্রমের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া তাহাকে রক্ষা করিবার পক্ষে এমন একজনের দরকার ছিল, যে তাহার মনের কোণের গোপন সংবাদ জানিতে পারিবে না—যে তাহার কথা লইয়া আলোচনা করিয়া কোন কিছু বেফাঁস করিয়া ফেলিবে না। এই পক্ষে ছেলেমানুষ পরেশই একমাত্র উপযুক্ত পাত্র। ১০ম পরিচ্ছেদে পরেশকে আমাদের চোখে পড়ে। বিজয়া নরেনের খবর জানিবার আশায় বাতাসা কিনিয়া আনাইবার ছলে গোপনে সরল নির্ব্বোধ পরেশকে পাঠাইতেছে, আর, কেহ জিজ্ঞাসা করিলে সে যেন নরেন-বাবুর কথাটা চাপা দিয়া বাতাসা কিনিবার কথা বলে তাহাও সে শিখাইয়া দিতেছে। অবশ্য বাতাসা কেনা ব্যাপারটা নিছক মিথ্যা নহে, বেশ সত্য। পরেশের অস্তিত্বের অন্য যে আবশ্যকতা আছে তাহা পরে আলোচনা করা যাইতেছে।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে পরেশকে আমাদের আবার চোখে পড়ে। সে এবারও বিজয়ার কাজে নিযুক্ত। প্রথম বারে সে নরেনের ঠিক সংবাদ আনিতে পারে নাই। দ্বিতীয় বারে সে নরেনকে ধরিয়া আনিতেছে।

নরেনের বাড়ী-ঘর অধিকার করিয়া ব্রাহ্ম-মন্দির প্রতিষ্ঠা করা হইয়াছে। এই ত আজ সকালে বিলাসের সহিত বিজয়ার বিবাহের কথা বাহ্যতঃ পাকাপাকি হইয়া গেল। উপাসনা-শেষে সকলে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। তবে আবার নরেনকে মাঠের মাঝখান হইতে ধরিয়া আনিবার কি আবশ্যকতা থাকিতে পারে, কি ঘনিষ্ঠতা থাকিতে পারে? পূর্ব্বেই রাসবিহারী ও বিলাস তাহাকে অযথা অপমানিত করিয়াছে। নরেনের উপস্থিতি তাঁহাদের কাম্য নহে। নরেন অনাহারে দুপুর রোদে এত পথ হাঁটিয়া চলিয়া যাইতেছে। ইহাও বিজয়ার অসহ্য। অন্য কাহাকেও দিয়া ডাকিয়া পাঠাইলে তাহা বিজয়ার পক্ষে দেখিতে একটু খারাপ বোধ হয়। কাজেই এবারেও পরেশকে দরকার হইল। লোকে গাঁজাগুলির নেশা করে গোপনে। কিন্তু সে যখন প্রথম নেশা করিতে আরম্ভ করে তখন তাহার নেশার খবরটাও যাহাতে গোপন থাকে, কেহ জানিতে না পারে— সে-দিকেও সে সতর্ক থাকে। পরে খবরটা লোক-জানাজানি হইয়া গেলেও সে গোপনেই নেশা করে। বিজয়ার পরেশকে দিয়া নরেনের খবর জানিতে চেষ্টা করা বা তাহাকে দিয়া নরেনকে ডাকিয়া আনা অনেকটা একই প্রকার। কাজেই পরেশের অস্তিত্বটা অবজ্ঞা করিবার মত নহে। শেষে পরেশকে চোখে পড়ে—সে একটি ছোট্ট গাইডের (guide) মত সিঁড়ি বাহিয়া বারান্দা দিয়া দীর্ঘকায় নরেনকেই বিজয়ার নিকটে লইয়া চলিয়াছে। দৃশ্যটা উপভোগ্যই বটে! পরেশের ছেলেমানুষী কথাগুলি আরও উপভোগ্য।

তারপর আখ্যায়িকার সরসতার দিক্ দিয়াও পরেশের স্থান আছে। আখ্যায়িকার ১ম হইতে ৯ম পরিচ্ছেদ পর্য্যন্ত বনমালীর মৃত্যু, বিলাস-বিহারীর ধর্ম্মের উৎকটতা ও তাহার দ্বারা বিজয়ার অপমান, রাসবিহারীর কুটিল কৌশল, নরেনের বাস্তুহীনতা, বিজয়ার সহায়হীনতা ও সঙ্গীবিহীনতা প্রভৃতি ব্যাপারে পাঠকের চিত্ত ক্ষুব্ধ ও কাতর হইয়া উঠে, এই অবস্থায়

এমন কিছুর দরকার যাহা সরস ও সরল, অথচ নির্ম্মল ও পবিত্র। বিজয়ার সংসারে নিজের বলিতে কেহ নাই। বিজয়ার মা নাই, বাপ নাই, ভাই নাই, বোন নাই, একটা খুড়া-জ্যেঠা পর্য্যন্ত নাই, একটা বন্ধু-বান্ধবও কেহ নাই যাহার সহিত সে দু'দণ্ড কথা বলিয়া গল্প করিয়া কাটাইতে পারে, এবং সেই সঙ্গে পাঠকও একটু উল্লাসবোধ করিতে পারেন। এখনও বিজয়ার সহিত নরেনের ঘনিষ্ঠতা হয় নাই। এমনি অবস্থায় পরেশের আসিবার দরকার ছিল। পরে ২২শ পরিচ্ছেদে পরেশ হাজির হইলেও তখন নরেনের সহিত বিজয়ার ঘনিষ্ঠতা হইয়াছে বলিয়া আখ্যায়িকাকার তাহাকে আর বেশী ক্ষণ আটকাইয়া রাখেন নাই। কাজেই আখ্যায়িকার সরসতা রক্ষা করিবার জন্য বৈষয়িক আলোচনার একঘেয়েমি দূর করিবার পক্ষে পরেশের দরকার ছিল, এবং সে 'দত্তা'-আখ্যায়িকায় অবজ্ঞার পাত্র নহে।

শরৎচন্দ্র ছোট্ট বালক পরেশের মত, সামান্য জিনিষ চায়েরও একটা স্থান করিয়া দিয়াছেন। আখ্যায়িকার মধ্যে তিনি কয়েক বার চায়ের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াছেন। অবশ্য, চা জিনিষটা শিক্ষিত বাঙ্গালী সমাজে কেন, নিরক্ষর কুলী শ্রেণীর মধ্যেও স্থান লাভ করিয়া অন্নব্যঞ্জনের মত একটা অত্যাবশ্যক জিনিষরূপে পরিগণিত হইয়াছে। আখ্যায়িকার মধ্যে দুই এক স্থলে চা জিনিষটা চরিত্র-বিকাশের পক্ষে সহায় হইয়াছে, যেমন, ৮ম পরিচ্ছেদে দেখা যায়,—"ভৃত্য চায়ের সরঞ্জাম লইয়া প্রবেশ করিতেছে দেখিয়া সে (বিজয়া) পুনরায় বসিয়া পড়িল।" বিজয়াকে বিলাসের সাম্‌নে বসিয়া চা তৈয়ারী করিতে হইবে। বিজয়া চলিয়া গেলে বিলাসের রাগটা ঠিক প্রকাশ পাইত না এবং সেই রাগের বিরুদ্ধে বিজয়াও যে কতখানি সংযত গম্ভীর তেজস্বিতা প্রকাশ করিতে পারে তাহাও হয়ত ঠিক তখন ধরা পড়িত না। কাজেই জিনিষটা মানবের শরীর-গঠনে কতখানি কাজে লাগিয়াছে জানি না, তবে লেখকগণ চট্ করিয়া

একটা উপলক্ষ ঠিক করিয়া লইবার মত সুবিধা পাইয়াছেন। আজকাল অনেকে সময় কাটাইবার মত অন্য কোন পথ না পাইয়া চা-পানে তথা আলোচ্য-অনালোচ্য নানা গল্প-গুজবে সময় কাটাইবার একটা সহজ সুবিধা লাভ করিয়াছেন।

পরিশিষ্ট

খ—'দত্তা' ও 'গোরা'

শরৎচন্দ্র 'দত্তা'-আখ্যায়িকায় দুই ভিন্নধর্ম্মাবলম্বী যুবক-যুবতীর মধ্যে যে মিলন ঘটাইয়াছেন, এইরূপ মিলনের উল্লেখ বাংলার আরও কয়েকজন লেখকের গ্রন্থের মধ্যে পাওয়া যায়। যে কয়েকখানি নাম-করা গ্রন্থের মধ্যে এই প্রকার মিলনের উল্লেখ দৃষ্ট হয় তাহার মধ্যে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'গোরা' উপন্যাসের কথা আমাদের সর্ব্বাগ্রে উজ্জ্বলভাবে মনে পড়ে। শুধু ভিন্নধর্ম্মের যুবক-যুবতীর মিলনের দিক্ দিয়াই নহে, আরও কয়েকটি কারণে 'দত্তা' পড়িতে পড়িতে আমাদের 'গোরা' উপন্যাসের কথা আপনা হইতেই মনে পড়ে। 'দত্তা'য় বিজয়া শিক্ষিতা ব্রাহ্ম যুবতী, নরেন্দ্র শিক্ষিত হিন্দু যুবক। 'গোরা'য় সুচরিতা ও ললিতা দুই শিক্ষিতা ব্রাহ্ম যুবতী, গোরা ও বিশেষভাবে বিনয় শিক্ষিত হিন্দু যুবক। প্রধানতঃ এই কারণেই দত্তা পড়িতে গিয়া আমাদের 'গোরা'র কথা মনে পড়ে।

চরিত্রের বর্ণনার সামঞ্জস্যের দিক্ দিয়া বিচার করিতে গেলে কয়েকটি কথা আমরা ভুলিতে পারি না। 'গোরা'য় হারাণ-বাবু ও সুচরিতা উভয়েই ব্রাহ্মসমাজের। তাহাদের মধ্যে বিবাহের কথাটা সুচরিতার বাড়ীর সকলেই এমন কি বাহিরে ব্রাহ্মসমাজের অনেকেই এক-প্রকার পাকাপাকি বলিয়া মনে করিয়া লইয়াছিলেন, সুচরিতাও প্রথম অবস্থায় হারাণ-বাবুকে প্রণয়ের চক্ষে না দেখিলেও শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিত। এমনি অবস্থায় গোরা একটা প্রচণ্ড ঝড়ের মত আসিয়া সমস্ত লণ্ডভণ্ড করিয়া দিয়া চলিয়া গেল। তাহাতে সুচরিতা সত্যই আর পূর্ব্বের মত হারাণ-

বাবুকে শ্রদ্ধা করিতে পারিল না। 'দত্তা'য় বিজয়া ও বিলাস উভয়েই ব্রাহ্ম-সমাজের, তাহাদের বিবাহ-ব্যাপার এক-প্রকার স্থির হইয়া গিয়াছিল। কথাটা সাধারণেরও অগোচর ছিল না। প্রথম অবস্থায় বিজয়ারও বিলাসের প্রতি টান ছিল। এ-দিকে নরেন্দ্রনাথ একটা উল্কার মত আসিয়া বিজয়া ও বিলাসের মধ্যে তুমুল তুফানের সৃষ্টি করিয়া দিল। হারাণ-বাবুর ধর্ম্মভাবের উৎকটতা, আত্ম-গরিমা ও হিংসা বিলাসের ধর্ম্ম-ভাবের উগ্রতা, আপন-বড়া ভাব ও হিংসার সহিত অনেকাংশে মিলিয়া যায়। তবে বিলাসের মধ্যে এই গুণগুলি যেন মূর্ত্তিমানরূপে প্রকাশ। হারাণের সহিত বিবাহে সুচরিতা অন্তরের সহিত সায় না দিলেও সে বুঝিয়াছিল যে, হারাণ-বাবুর সহিত তাহার বিবাহ হইয়া যাইবে। বিলাসের সহিত বিবাহে বিজয়া অন্তরে সায় না দিলেও সে যে কারণেই হউক মনে করিয়াছিল যে, বিলাসের সহিত তাহার বিবাহ রোধ হওয়ার সহজ পথ নাই।

'দত্তা'র অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে বিলাস নরেনের প্রতি হিংসায় পুড়িয়া দয়ালকে দোষ দিতে গিয়া যে-ভাবে বিজয়ার কাছে অপমানিত হইয়াছে এবং তাহাতে পাঠকের মনের অবস্থা যে-প্রকার হয় তাহা 'গোরা'র ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদের ঘটনার সহিত তুলনীয়। হারাণ-বাবুর প্রতি সুচরিতার আর পূর্ব্বের মত আগ্রহ ছিল না। ললিতা গোরার জেল হওয়ার উপলক্ষ ধরিয়া যে হিন্দু যুবক বিনয়ের সহিত ম্যাজিষ্ট্রেটের বাংলা হইতে কলিকাতা পলাইয়া আসিয়াছে তাহা হারাণ-বাবুর অগোচর ছিল না। হারাণ-বাবুর ধর্ম্মের আবরণের পশ্চাতে হিংসা জাগিয়া উঠিয়াছিল। তিনি সরল তত্ত্বদর্শী দয়ালের সমভাবাপন্ন পরেশ-বাবুর উপর দোষারোপ করিতে আসিয়া ললিতা ও সুচরিতার নিকট হইতে বেশ কড়া জবাব পাইলেন। অপমানিত হওয়া আর কা'কে বলে। "হারাণ বাবু, আপনার ঘরে গিয়ে আপনার বিচার-শালা আহ্বান করুন।

গৃহস্থের ঘরের মধ্যে চড়ে তাদের অপমান কর্‌বেন, আপনার এ অধিকার আমরা কোনমতেই মান্‌ব না।" বিজয়ার কথার ভাষা সুচরিতার কথার ভাষা অপেক্ষা একটু উগ্র হইলেও উভয়েরই কথার সুর ও ঝাঁঝ একই প্রকারের তীব্র। হারাণ-বাবুর প্রশ্ন করিবার কূট কায়দা কৌশলী রাসবিহারীর সহিত তুলনীয়। হারাণ-বাবু কহিলেন, "এই যে আপনার কন্যা ললিতা একলা বিনয়-বাবুর সঙ্গে ষ্টীমারে ক'রে চলে এলেন এটাও কি কাল্পনিক?"—৪৩শ পরিচ্ছেদ, 'গোরা'। এই কথায় হারাণ-বাবু বিনয়ের সহিত ললিতার যে অসঙ্গত সম্বন্ধের ইঙ্গিত করিলেন, রাসবিহারীও একদিন নরেনের সহিত বিজয়ার এই প্রকার অসঙ্গত সম্বন্ধের প্রাঞ্জল ইঙ্গিত করিয়াছেন। "একটা অজানা অচেনা হতভাগাকে মাঠের মধ্যে থেকে ধরে এনে যে কাল সমস্ত বেলাটা কাটালে তার মানে কি আমি বুঝ্‌তে পারি নি? শুধু কি তাই? সে-দিন দুপুর রাত্রি পর্য্যন্ত তার সঙ্গে হাসি-তামাসা-গল্প ক'রেও তোমার যথেষ্ট হ'ল না, সে রাত্রে কল্‌কাতায় ফির্‌তে পার্‌লে না, ছল ক'রে তাকে এইখানেই থাক্‌তে হ'ল। এতে তোমার লজ্জা হয় না বটে, কিন্তু আমার যে ঘরে-বাইরে মুখ পুড়ে গেল। সমাজে কারো সাম্‌নে মাথা তোল্‌বার যে আর জো রইল না,"—২৩শ পরিচ্ছেদ, 'দত্তা'। হারাণ-বাবু কহিলেন, "না, সুচরিতা, তুমি চলে গেলে চল্‌বে না—এ কথার উত্তর দিতে হ'বে—এ গুরুতর কথা।" সুচরিতা কহিল, "যতই গুরুতর হোক্‌, এ কথায় আপনার কোন অধিকার নাই"—'গোরা'। রাসবিহারী কহিলেন, "চুপ ক'রে থাক্‌লে হ'বে না, বিজয়া, তোমাকে জবাব দিতে হ'বে। এ সকল গুরুতর ব্যাপার, জবাব দেওয়া চাই।" বিজয়া ধীরে ধীরে কহিল, "ব্যাপার যত গুরুতর হোক্‌, মিথ্যে কথার আমি কি জবাব দিতে পারি?"—'দত্তা'।

'দত্তা'য় রাসবিহারী চরিত্রে যে নাছোড়বন্দা ভাবটি প্রকাশ পায়, 'গোরা'য় হারাণ-বাবুর মধ্যেও ঠিক সেই ভাবটি বহু স্থানে প্রকাশ পাইয়াছে।

'গোরা'য় সপ্তপঞ্চাশ পরিচ্ছেদে সুচরিতার সঙ্গে হারাণ-বাবুর কথায় ও ব্যবহারে এই নির্ল্লজ্জ নাছোড়বন্দা ভাবটি পাঠকের ভুলিবার নয়। সুচরিতা তাহার কথা বলিবার সময় নাই বলিলেও যেন হারাণ-বাবু তাহাকে কোন না কোন ছলে ছাড়িতে চান না। খাওয়ার সময় সুচরিতা গোরাকে লইয়া অন্য ঘরে চলিয়া গেলেও হারাণ-বাবু অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। বিজয়ার সহিত কথাবার্ত্তায় ব্যবহারে রাসবিহারীর এই নাছোড়বন্দা ভাব ও নির্ল্লজ্জতা ধূর্ত্ততা-মিশ্রিত থাকিলেও তাহা স্নেহের বাহ্যিক আবরণে ঢাকা ছিল। কিন্তু হারাণ-বাবু ও রাসবিহারী উভয়েরই প্রতি পাঠকের মন সমান তিক্ততা ও বিরক্তিতে ভরিয়া উঠে। হারাণ-বাবুর ধর্ম্মভাবের উগ্রতা, হিংসা ও আত্মম্ভরিতা বিলাসের মধ্যে এবং শঠতা, কুটিলতা ও নাছোড়বন্দা ভাব যেন রাসবিহারীর মধ্যে মূর্ত্তিমান হইয়া সমধিক বিকাশ লাভ করিয়াছে।

'দত্তা'য় দয়াল সরল, শান্ত, ও সকলেরই প্রতি সমান উদারভাবাপন্ন, কাহারও প্রতি তাঁহার হিংসা বা বিদ্বেষ নাই। 'গোরা'য় পরেশ-বাবুও সরল, শান্ত, শ্রীমণ্ডিত ও উদারচেতা। পরেশ-বাবু দয়াল অপেক্ষা অধিক গভীরদর্শী ও অধিক সূক্ষ্ম-অনুভূতিপরায়ণ। পরেশ-বাবু যেমন আপন স্বাভাবিক উদার হৃদয়ের বলে বিনয় ও ললিতার মিলন সংঘটনে সহায় হইয়াছেন, দয়ালও সেইরূপ ভাগিনেয়ী নলিনীর পরামর্শে ও আপন উদারতায় নরেন্দ্র ও বিজয়ার মিলন সংঘটনে সহায়তা করিয়াছেন। দয়ালের কথা ভাবিতে গেলে পরেশ-বাবুব কথা না ভাবিয়া পারা যায় না। তবে 'গোরা' উপন্যাস 'দত্তা' অপেক্ষা অনেক বড় বলিয়া চরিত্রগুলির সমধিক বিকাশের পক্ষে বিশেষ অনুকূল হইয়াছে।

'গোরা'য় গোরা যেমন ভারতের সমাজ ও সাধনা লইয়া নির্লিপ্ত ছিল, তাহার কাছে প্রণয় বা নারীর কোন স্থান ছিল না, ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়া সে নারীর স্বরূপ ও সত্তা অনুভব করিয়াছিল; সেইরূপ 'দত্তা'য় নরেনের মনে প্রণয় বা নারীর কোন স্থান ছিল না, সে কেবল তাহার বৈজ্ঞানিক

বিশ্লেষণ লইয়াই অধিকাংশ সময় ব্যস্ত থাকিত এবং তাহাতেই সে আপন-ভোলা হইয়া গিয়াছিল, পরে ঘটনাচক্রের মধ্য দিয়া সে বিজয়ার প্রতি আসক্ত হয়।

সর্ব্বশেষে একটি চরিত্রের কথা আমরা ভুলিতে পারি না। 'দত্তা'য় 'পরেশের মায়ের পরেশ' পাঠকের মনে যে তৃপ্তি, যে স্বস্তি, যে বিরাম ও যে আরাম দেয় এবং আখ্যায়িকার দিক্ দিয়া যে উদ্দেশ্য সাধন করে, 'গোরা'য় সতীশ ছেলেটি পাঠকের মনে ঠিক সেই একই স্ফূর্ত্তি, একই আনন্দ দান করে এবং উপন্যাস গঠনে তাহারও একটা বিশিষ্ট স্থান আছে।

'দত্তা' আখ্যায়িকার শেষ পরিচ্ছেদের একস্থানে দেখা যায়—নলিনী বল্‌লে, "মামা, তুমি ত জানো, বিজয়ার অন্তর্য্যামী কখনও সায় দেন নি, তার চেয়ে কি বিজয়ার বলাটাই বড় হ'ল, তার হৃদয়ের সত্যকে লঙ্ঘন ক'রে কি তার মুখের কথাটাকেই বড় ক'রে তুল্‌তে হবে? তিনি (নরেন-বাবু) বার বার বলেন, সত্যের স্থান বুকের মধ্যে, মুখের মধ্যে নয়। কেবল মুখ দিয়ে বার হ'য়েছে বলেই কোন জিনিষ সত্য হ'য়ে উঠে না।" 'দত্তা'র এই অংশ পড়িতে পড়িতে 'গোরা'র পঞ্চসপ্ততিতম পরিচ্ছেদের কথা আমাদের মনে পড়ে। "কিন্তু দলিল লিখিয়া দিলেই তো তখনি কাজ শেষ হয় না। তার হৃদয় যে সে দলিলকে একেবারে অগ্রাহ্য করিয়া দিল। সে দলিলে কেবল গোরার ইচ্ছাশক্তি জোর কলমে নাম সই করিয়া দিয়াছিল বটে কিন্তু তাহার হৃদয়ের স্বাক্ষর তো তাহাতে ছিল না—হৃদয় তাই অবাধ্য হইয়া রহিল।"

'দত্তা' পাঠ করিতে গিয়া এই ভাবে 'গোরা'র অনেক কথাই আমাদের মনে পড়ে। আমার এই কথায় কেহ যেন স্থির করিয়া না বসেন যে, আমি 'দত্তা'য় 'গোরা'র ছায়াপাত প্রমাণ করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছি। এ-দিক্ দিয়া দুইটি কথা বলা দরকার মনে করি। প্রথমতঃ, 'দত্তা'-আখ্যায়িকার সুর গোরা-উপন্যাস হইতে স্বতন্ত্র বলিতে পারা যায়।

তারপর এ বিষয়ে শরৎচন্দ্রের হাত জ্ঞানতঃ কতখানি আছে তাহা বলা শক্ত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসে ইংরেজ-কবি স্কটের 'আইভ্যান হো' উপন্যাসের ছায়া বহুল পরিমাণে দৃষ্ট হইলেও তাহা সজ্ঞান ছায়াপাত নহে, কারণ বঙ্কিম-বাবুই বলিয়াছেন—'দুর্গেশনন্দিনী' লিখিবার পূর্ব্বে আমি 'আইভ্যান হো' পড়ি নাই। কাজেই 'দত্তা'র উপর 'গোরা'র সজ্ঞান ছায়াপাতের কথা আলোচনা করিতে গিয়া আপাততঃ আমাদিগকে নীরব থাকিতে হইবে। অজ্ঞান ছায়াপাতের কথা বলিতে গেলে বলিতে হয় 'দত্তা' লিখিবার পূর্ব্বে শরৎচন্দ্র নিশ্চিতই বহুবার 'গোরা' পাঠ করিয়াছেন। তাহাতে যদি উভয় গ্রন্থের মধ্যে কিছু সাদৃশ্য থাকে বা ঘটে তবে শরৎচন্দ্র নাচার।

'দত্তা' যে 'গোরা' হইতে স্বতন্ত্র, তাহার প্রথম ও প্রধান কথা এই যে, 'দত্তা' সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকের হৃদয়স্পর্শী ও পরম-উপভোগ্য। কিন্তু 'গোরা' সর্ব্বশ্রেণীর পাঠকের উপযোগী ত নহেই, বরং ইহা কেবলমাত্র এক বিশিষ্ট শ্রেণী অর্থাৎ যাকে বলে শিক্ষিত বা cultured class, তাহারই উপযুক্ত, ইহা হৃদয়স্পর্শী যতখানি হউক না কেন, মস্তিষ্ক-আলোড়নকারী ততোধিক। 'দত্তা' সহজ সরলভাবে সোজাসুজি গিয়া আপনা হইতেই পাঠকের হৃদয় স্পর্শ করে, মুগ্ধ করে, অবশেষে মিশিয়া যায়, তাহাতে কোন প্রকার সচেষ্ট ভাব নাই, আয়াস-স্বীকার নাই, আছে নিবিড় একাত্মভাব। 'গোরা' কিন্তু সে-প্রকার নহে। ইহার মস্তিষ্কের সিংহদ্বার পার হইয়া হৃদয়মূলে পৌঁছিবার কথা। কাজেই ইহার 'দত্তা'র মত সোজাসুজি হৃদয়কে মুগ্ধ করিবার পক্ষে বা হৃদয়ের সহিত মিশিবার পক্ষে একটা চিরন্তন বাধা আসিয়া যায়। অবশ্য ইহাও সত্য যে, এই বাধা অতিক্রম করিতে পারিলে একটা মীমাংসিত শান্তির রাজ্যে উপস্থিত হওয়া যায়। কিন্তু এ-দিক্ দিয়াও যেন একটা aristocratic ভাবের ছায়া লক্ষিত হয়। এক কথায় 'গোরা' অতি বিতর্কাত্মক।

'দত্তা' ও 'গোরা' উভয়ত্রই গ্রন্থকারদ্বয়ের মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণের অদ্ভুত ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু 'দত্তা'য় শরৎচন্দ্রের মনস্তত্ত্ববিশ্লেষণ করিবার ইচ্ছার প্রাবল্য, আগ্রহের স্বাতন্ত্র্য লক্ষিত হয় না, তাঁহার মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ তালে তালে ধাপে ধাপে পাঠকের হৃদয়ের সহিত চলিতে থাকে। কিন্তু 'গোরা'য় রবীন্দ্রনাথের তত্ত্ব-বিশ্লেষণের প্রবল অনুভূতি ও তীব্র ইচ্ছাটুকুও পরিস্ফুটরূপে বিদ্যমান আছে। ফলে গ্রন্থখানি তর্কাত্মক হইয়া উঠিয়াছে। 'দত্তা' মনোজ্ঞ, উপভোগ্য, ও হৃদয়স্পর্শী। আর 'গোরা' উপভোগ্য হইলেও ইহা তত্ত্বের ব্যাখা ও বর্ণনায় জটিলতাপূর্ণ হইয়া মাথা উঁচু করিয়া আপনাকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে চায়। কাজেই 'দত্তা'র উপর 'গোরা'র ছায়াপাতের কথা মনে করিলে যেমন খুব দোষের হয় না, তেমন এই ছায়াপাতের দোহাই দিয়া শরৎচন্দ্রকে অভিযুক্ত করিয়া হীন প্রতিপন্ন করা যায় না।